চতুর্থ অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটক বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ''আমি মনে করি আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী।''[১] উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক-শ্রেণির তথা নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। তাঁর নাটক সদাসর্বদা গর্জে উঠেছে যখনই তিনি দেখেছেন বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণি যখন অত্যাচারিত হয়েছে। তিনি আদ্যন্ত মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন ''মার্ক্সবাদ হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণির মতবাদ।''[২] মার্ক্সবাদী রাজনীতি শ্রমিক-শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদকে বুঝতে গেলে শ্রমিক-শ্রেণি তথা শোষিত-নিপীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। 'ব্রেখ্ট্ ও মার্ক্সবাদ' প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্কবিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।*[৩]

উৎপল দত্ত শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণিকে তথা শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। শ্রমিক-শ্রেণির দুর্দশা, তাদের প্রতি শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন কালজয়ী বিভিন্ন নাটক। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় বামপন্থা সম্পর্কে তথা কমিউনিজম সম্পর্কে পুথিগত শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা সরাসরি নাটকের মধ্যে প্রয়োগ করে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে নাট্যাঙ্গনে আনয়নের মধ্য দিয়ে। 'লিট্ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন,

> *বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছ্যুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে।*[৪]

উৎপল দত্ত মার্ক্সবাদী শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্বীত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক

জগৎকে বুঝতে গেলে ও জানতে গেলে পার্টিরই সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা কখনো আবীলতায় আচ্ছন্ন তো হয়ই না, বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়। 'জপেনদা জপেন যা' প্রবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *কোন দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।* [৫]

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ যখন মিনার্ভায় নিয়মিত নাটক করতে শুরু করল তখন উৎপল দত্ত ও তাঁর নাট্যদল নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা শুরু করল। তারা ভাবল মানুষের কথা মানুষের কাছে বলতে গেলে মানুষের জীবন ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। তাদের কথা তাদের কাছ থেকে জানতে হবে। তা না হলে জীবন সমস্যায় জর্জরিত-শোষিত-নিষ্পেষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের প্রাণের কাছে পৌঁছানো যাবে না। এইসময় উৎপল দত্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল নাটকে শ্রমিক আন্দোলনকে তুলে ধরা। বাংলা নাটকের আঙিনায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণির কোনো স্থান হয়নি। একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী হিসেবে উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন বঙ্গীয় নাট্যশালায় শ্রমিক শ্রেণিকে প্রাধান্য দিতে ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নিয়ে আসতে। শোষিত-বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত শ্রমিকের জীবন ও সংগ্রামকে রূপায়িত করে বাংলার থিয়েটারে বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলা নাট্যশালায় উৎপল দত্তের আগে কেউই হাঁটেননি। সাহসিকতার সঙ্গে তিনি হন পথিকৃত, নতুন চিন্তার দিশারী, নতুন যুগের স্রষ্টা। উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> *নাটক কোন তারে বাঁধব তা নির্ভর করে আমার দর্শকের ওপর। বাংলা রাজনৈতিক নাটক কার সামনে অভিনীত হবে? রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর আকাদেমি নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে, সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না। সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়। যেখানে এ নাটক প্রধানত অভিনয় হবে, সেখানে থাকবে দশ থেকে বিশ হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ, থাকবে অত্যন্ত নির্জীব মাইক এবং থাকবে আশেপাশে হাটুরে কোলাহল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যসুষমামণ্ডিত সামাজিক নাটক অভিনয় করতে যাওয়ার বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতা যার হয়েছে, সে-ই বোঝে কেন রাজনৈতিক নাটক আমাদের দেশে চড়া সুরে বাঁধতে হয় ।* [৬]

সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে

মঞ্চে উপস্থাপনা করলেন। বিহারের ধানবাদ অঞ্চলের বরাধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখলেন 'অঙ্গার' নাটকটি। সেখানকার কয়লাখনিতে আগুন লাগা ও জল ঢুকে যাওয়ার ফলে খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনা করলেন আলোচ্য নাটকে। উৎপল দত্ত ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীরা গিয়ে বরাধেমো অঞ্চলে গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখলেন, যেসব শ্রমিকেরা বেঁচে ফিরেছিল তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ও তাদের শোষিত অবস্থার নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করে নাটকে তুলে ধরলেন। কয়লা খনির গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া, স্রোতের সঙ্গে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যে আপ্রাণ চেষ্টা ও মর্মান্তিক লড়াই বাংলার থিয়েটারে কিংবদন্তি হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের বাঁচার লড়াই।

কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন অবলম্বনে ও বাস্তব ঘটনাভিত্তিক এই 'অঙ্গার' নাটকে প্রথম থেকেই শ্রমিকদের ওপরে যে শোষণ-অত্যাচার ও বঞ্চনার যে জীবনধারা তার মুখোমুখি হই। আমরা জানতে পারি কয়লা খনির খাদের নীচে প্রায়শই গ্যাস জমে যা শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণহানির সম্ভাবনা কিন্তু এ-নিয়ে মালিক পক্ষের কোনোরূপ ভ্রক্ষেপ নেই। মালিক পক্ষ শুধুই জানে তাদের মুনাফা। খরচ নয়, আয় করাই তাদের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের প্রাণ যাক আর থাক। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দীননাথের কথায় সে ত্রুটি ফুটে ওঠে—

> *দীনু।। গ্যাস জমছে। মেথেন গ্যাস। শালার ব্যাটা শালা কোম্পানি ফ্যানগুলো মেরামত করবে না। গ্যাস জমছে আর জমছে।* [৭]

আবার দীননাথকে বলতে শুনি—

> *দীন।। ...বাতি দেখে বুঝতে হয় গ্যাস আছে কিনা। কোনো মিটার কিনবে না শালা ফিরিঙ্গি কঞ্জুষের বাচ্চারা।* [৮]

মালিক শ্রেণির শোষণ ও শ্রমিকদের বঞ্চনার রূপটি নাটকের প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

খনিতে দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হয় কিন্তু কোম্পানি শ্রমিকদের মৃত্যুর কোনো দায় স্বীকার করে না, তারা কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে চায় না। দায় এড়ানোর জন্য দীননাথ ও কালু সিং-এর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে যাতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। তারা তাদের তদন্ত রিপোর্টে বলে, খাদের নীচে গ্যাস জমার ফলে শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। এমনকি শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে এ সংবাদটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের মতে—

> *ভারতীয় শ্রমিকদের এটা চিরাচরিত প্রথা। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে তারা গা ঢাকা দেয়, যাতে তাদের*

পরিবার কিছু পয়সা হাতাতে পারে ক্ষতিপূরণ হিসাবে। [৯]

মৃত্যুর খবর কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনোভাবেই স্বীকার করা হয় না যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় তার জন্য সমস্ত রকম কু-প্রচেষ্টা তারা করতে থাকে। তাদের মতে শ্রমিক দীননাথ আদতে মরেনি সে বেঁচে আছে ও লুকিয়ে আছে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায়। দীননাথ ও কালু সিং-এর মৃতদেহকে এমনভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। তাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয় যাতে কেউ শনাক্ত করতে না পারে—

> *ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্য এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন।* [১০]

উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির শোষিত-নির্যাতিত ও বঞ্চিত অবস্থার মর্মান্তিক চেহারা তুলে ধরেছেন। আর্থিক শোষণ তো ছিল-ই সেই সঙ্গে শোষণের জাঁতাকলে শ্রমিকরা নিজেদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে, কীভাবে তারা নিজেদের মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি দর্শকের সামনে তিনি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। তৃতীয় দৃশ্যে আমরা শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হই এবং জানতে পারি এরা শুধু আর্থিকভাবে চূড়ান্ত শোষিত তা নয়, এদের কাজ পেতে গেলে কিংবা কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে গেলে কোম্পানির মুন্সিদের ঘুষ দিতে হয়। এই বঞ্চিত শ্রমিকরা কেউ কেউ হয়তো কাবুলিওয়ালাদের কাছে দেনাগ্রস্ত, কাজ করে সেই দেনা শোধ করার পরিকল্পনা করে। এদের মধ্যে আবার অনেক শ্রমিকের যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লার গুঁড়ো গিয়ে ফুসফুসটা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে অনেকের কয়লা বয়ে বয়ে পেট জখম হয়ে গিয়েছে। হয়তো কখনো ছেলেপুলেও হবে না। এইসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে—

> *আরিফ।। এই কাশি— ডাক্তার বলেছে আমার যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লার গুঁড়ো গিয়ে গিয়ে ফুসফুট ফুটো*
>
> *হয়ে গেছে।*
>
> *মোস্তাক।। সে তো সকলেরই হয় দাদা।*
>
> *বিনু।। তা তোমার অমন অসুখ, রুক্‌মিকে বিয়ে করা কি উচিত হোত?*
>
> *আরিফ।। ওরও তো অসুখ। কয়লা বয়ে বয়ে ওর পেট জখম হয়ে গেছে। ছেলেপুলে হবে না।* [১১]

কোম্পানির কাজের জন্য শ্রমিক শ্রেণির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শরীর থাক আর যাক সেদিকে লক্ষ করার ফুরসত পর্যন্ত পায় না, অথচ এই কোম্পানি অতিরিক্ত লোভে কয়লা কাটতে কাটতে শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে কুদরৎ-এর কথায় তা প্রকাশ পায়—

> *কুদরৎ।।... আইন আছে সুরঙ্গ ষোল ফুটের বেশি চওড়া হবে না, নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনারা, টাকার লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কিভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করে কোম্পানি।* [১২]

শ্রমিকরা যদি কখনো এই বিপদের মাঝখানে কয়লা তুলতে নিমরাজি হয় তাহলে কোম্পানির লোক শ্রমিকদের হুমকি দেয়, ভীতি প্রদর্শন করে এমনকি শ্রমিকদের প্রহার করতেও পিছুপা হয় না। অতিরিক্ত লোভ ও লালসা, অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তারা এই শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলিকে আশু বিপদের মাঝে ঠেলে দেয়। পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার থেকে কোম্পানির কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তাদের একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য যত বেশি সম্ভব লাভ করা বা কয়লা উত্তোলন করা। কোম্পানির এই নিষ্ঠুর মানসিকতা শ্রমিকদের কথাতেই প্রকাশ পায়—

> *এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে দীনুদাকে চিনতো না। তিনি ছিলেন সবার দাদা। তাঁকে যখন খাদে পাঠিয়ে মারলো, তখন থেকেই কোম্পানি জানে গ্যাস জমেছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো ব্যবস্থা করেনি। ফ্যান কমজোর হয়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই, বালি ছড়ানো বন্ধ করেছে। কয়লার গুঁড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো হলদে নিবু নিবু দেখায়। কারণ খরচা ওরা করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে ষাট সত্তর করতে পারলে ভালো হয়। আর সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে, তাদের জীবন রক্ষার কি ব্যবস্থা ওরা করছে বলুন?* [১৩]

চতুর্থ দৃশ্যে কোম্পানি ও মালিক শ্রেণির ছলনা ও চাটুকারিতার এক নির্লজ্জ রূপ উৎপল দত্ত দর্শকের সামনে উপস্থাপনা করেন। সমাজের শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিকদের ঠকাবার নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে কোম্পানির লোকেরা। এ দৃশ্যে দেখা যায়, শ্রমিকরা যখন প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে নাজেহাল দুবেলা-দুমুঠো অন্নসংস্থানে অপারগ, ঠিক তখনই কোম্পানি ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের সামনে টাকার টোপ দেয়। কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও সুবাদার এসে শ্রমিকদের বলে যে খাদের নীচে গ্যাস পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবং তারা অফিসারদের রিপোর্ট দেখায়। শ্রমিকরা তাদের কথায় সংশয় প্রকাশ করলে সুবাদার তাদেরকে স্পেশাল বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং হরতালের সময়কার পুরো পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। সুবাদার চালাকি করে এটাও বলে যে, খাদের নীচে গ্যাস নেই এটা প্রমাণ করার জন্য সে

নিজে শ্রমিকদের সঙ্গে খাদের নীচে যাবে। আসলে নিঃস্ব-রিক্ত-শোষিত মানুষগুলিকে ঠকানোর নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করে কোম্পানি ও তার সহকর্মীরা।—

মহা।। কোম্পানি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে, বুঝলে?

দত্ত।। মানে আমরা Consider করলাম ব্যাপারটা। গ্যাসের রিডিং নেওয়া হয়েছে আজ। এই দেখ রিপোর্ট— এক পার্সেন্টেরও কম। [কাগজ বাড়িয়ে ধরেন।]

বিনু।। ওসব রিপোর্ট ভুল হয় অনেক সময়ে।

দত্ত।। বড় বড় অফিসারদের রিপোর্ট—

মহা।। থামুন স্যার— হ্যাঁ স্বীকার করছি, ভুল হয়। এ-ও স্বীকার করছি, খাদে নামায় বিপদ আছে। প্রচুর বিপদ আছে। আবার বিপদ না-ও ঘটতে পারে— অভিজ্ঞ মাইনার হিসেবে এটা মানো তো?

হাফিজ।। হ্যাঁ, এটা মানি।

মহা।। এসব জেনে শুনেও খাদে যাবে কেউ?

দত্ত।। আহাহা, অমন বেয়াড়াভাবে প্রশ্নগুলো তুলছেন কেন? কোম্পানী একজন শট্‌ফায়ারার ও এক গ্যাং মালাকাটা চায়। এদের Special Bonus দেওয়া হবে— প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে এবং সেই সঙ্গে Strike Period-এর পুরো পাওনা time rate হিসেবে ধরে দেয়া হবে।

হাফিজ।। উদ্দেশ্য?

দত্ত।। উদ্দেশ্য হোলো, খাদে যে গ্যাস নেই এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা।...

মহা।। জান যাওয়ার বিপদ নেই বলব না, তবে খুব কম। সেটা প্রমাণ করব এক্ষুনি।

বিনু।। প্রমাণ! প্রমাণ করবেন কি করে?

মহা।। ম্যানেজার সাহেবের হুকুম, আমি নিজে যাব আপনাদের সঙ্গে।[১৪]

আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত শ্রমিক চেতনার নানা জটিল স্তরকে প্রকাশ করেছেন। নানা শ্রমিকদের ভিড়ে তিনি এক অত্যাশ্চর্য শ্রমিক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন যার নাম সনাতন। সনাতন এক সাইকিক চরিত্র। সে অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। খাদের মধ্যে সাতদিন আটকে থাকার

ফলে তার মনে জন্ম নিয়েছে এক ভীষণ অন্ধকার ভীতি। সে এক বিচিত্র মানুষ। তার পরিচয় জানতে চাইলে সে অদ্ভুত রকমের কথা শোনায়। সে বলে—

আমি একজন ভূতপূর্ব লোক।[১৫]

বিনু যখন তার নাম জিজ্ঞাসা করে তখনও সে আশ্চর্য রকমের কথা বলতে থাকে। নাম জানতে চাইলে তার উত্তর—

কোন্ নামটা জানতে চাও? যখন জ্যান্ত ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল বৈদ্যনাথ। এখন সনাতন।[১৬]

সনাতন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এই অসংলগ্ন কথাবার্তার অর্থ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর। অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিকের প্রতি কোম্পানির যে অকথ্য অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচার সেটা সনাতন ও বিনুর সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।—

বিনু।। কি কাজ করেন?

সনা।। যখন জ্যান্ত ছিলাম তখন ছিলাম ইলেক্ট্রিশিয়ান। এখন মালকাটা।

বিনু।। বারবার ও-কথা বলছেন কেন? আপনি মরলেন কবে কি করে?

সনা।। তিনবছর আগে মরেছি। রাধানগর কোলিয়ারি যে ফেটে গেছল, তখন আমারও কর্ম সাফ।

খাদের মধ্যে ফ্যান সারাচ্ছিলাম। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম মরেছি। সাতদিন পরে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভূত দেখে সবাই পালাতে লাগল। বুঝলাম, আমি ভূতপূর্ব, আমি গত, আমি হত।

বিনু।। তারপর?

সনা।। তারপর বিষম খিদে পেল। কেমন সন্দেহ হলো— হয়তো বা আমি মরিনি, নইলে খিদে

পায় কেন? একটু পরে আমার বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমি ভাবলাম— গলা যখন আছে, তখন শরীরও আছে, তাহলে বোধহয় আমি ভূত নই, আমি বর্তমান। কিন্তু ভুল ভেঙে দিল কোম্পানি। ওরা বললে আমি নেই।

বিনু।। তার মানে?

সনাতন।। কোর্টে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে আমি নেই। মানে বদ্যিনাথ বলে কোনো লোক কস্মিনকালেও ছিল না। ওদের খাতায় বদ্যিনাথ বলে কোনো নামই নেই। তাই রাধানগরে কেউ

মরেনি। এমন সময়ে আমি গিয়ে কোম্পানির সামনে উপস্থিত। কোম্পানি বললে, তুমি কে? আমি বললাম— আরে আমি যে! বদ্যিনাথ! চিনতে পারছ না? ওরা বললে— বদ্যিনাথ বলে কেউ নেই প্রমাণ হয়ে গেছে : তারপর এমনভাবে হাজির হওয়ার মানে? আমি বললাম— আরে আমি যে! ওরা বললে— ওসব বুঝি না, দলিল-পত্রাদি থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি নেই, ছিলেই না, আর এখন এসে হেঁড়ে গলায় 'আমি যে' বললেই হলো। লোকে কি বলবে? এই বলে গলাধাক্কা! তারপর হাসপাতাল! মাস তিনেক সেখানে ভুলটুল বকে তারপর এখানে এসে কাজ নিলাম, সনাতন নাম নিয়ে। এমনি করে বদ্যিনাথ মরল। [১৭]

কোম্পানির লোকেরা শ্রমিক শ্রেণিকে সর্বশান্ত করার সমস্তরকম প্রচেষ্টা করে। তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য সমস্তরকম চক্রান্ত করতে তারা পিছুপা হয় না। বদ্যিনাথকে যাতে কোনো ক্ষতিপূরণ না দিতে হয়, তার জন্য তারা ক্ষমতার জোরে সমস্তরকম দলিল-পত্রাদি তৈরি করে রেখেছে এবং তা থেকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে যে বদ্যিনাথ বলে কেউ ছিল না। প্রয়োজনে তাকে পাগল সাজাতেও দ্বিধা বোধ করে না। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ময়নাতদন্ত' পথনাটকেও একইরকম মালিক শ্রেণির সন্ত্রাস ও শোষণের নগ্নরূপ পরিস্ফুটিত করেছেন। যেনতেনপ্রকারেণ নিঃস্ব-রিক্ত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণিকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল রপ্ত করে থাকে এই মালিক শ্রেণিরা। এখানে দেখা যায় কারখানার এক বঞ্চিত শ্রমিক তিনবার তার নাম পালটে এখন তার নাম হয়েছে জীবন হালদার। কারণ কারখানায় মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামও পরিবর্তন করতে হয় যাতে সেদিন থেকে সে নতুন লোক হিসেবে কাজ করতে পারে। নইলে যে অনেক বছর চাকরির সুযোগ সুবিধা দিতে হয় ফলে তাদের কাজ হারাতে হয়। নতুন লোক হয়ে কাজ করলে কাজ হারানোর ভয় থাকে না। কারণ নতুন লোকের মাইনে কম আর পুরানো লোকের মাইনে বেশি। কারখানার শ্রমিকদের নাম পালটে পালটে শেষে এমন পরিস্থিতি হয় যাতে তাদের আসল যে নাম সেটাই ভুলে যেতে হয়। একারণেই 'অঙ্গার' নাটকের প্রথম দৃশ্যে খনিশ্রমিক সনাতনের মুখ দিয়ে আমরা শুনতে পাই—

বড় গোলমেলে! আমার নিজেরই ঠিক থাকে না, আমি কে। [১৮]

আসলে উৎপল দত্ত এসবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের যে নিঃস্ব-রিক্ত-শোষিত রূপ তার বাস্তব ও মর্মান্তিক চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শোষক শ্রেণির জাঁতাকলে পড়ে শ্রমিকরা কীভাবে নিষ্পেষিত হয় তার জীবন্ত দলিল আলোচ্য 'অঙ্গার' নাটকটি।

মালিক শ্রেণির মুনাফালোভ ও শ্রমিক শ্রেণির প্রতি তাদের নৃশংসতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা

দেখতে পাই নাটকের শেষের দিকে অর্থের লোভ-লালসা মানুষকে কতটা হিংস্র, নৃশংস ও অমানবিক করে তোলে তারই প্রতিফলন ঘটে নাটকের শেষ অংশে। কোম্পানির কয়লা উৎপাদন কমে যাওয়ায় তারা ক্ষুধার্ত-নিঃস্ব-রিক্ত শ্রমিকদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে খনিতে নামতে বাধ্য করে। নাটকের শেষভাগে আমরা দেখতে পাই কয়লা খনির খাদের নীচে ৩৯, ৪০ ও ৪১ নম্বর ডিপ-এ আগুন লেগেছে, সেখানে বহু শ্রমিক মারা গেছে, তাদের দগ্ধ মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে উপরে। ৪২ নম্বর ডিপ-এ আগুন লাগেনি কিন্তু সেখানে আটকে আছে ছয় জন শ্রমিক এবং একজন সুবাদার। খনির নীচে গভীর অন্ধকারে অন্যান্য ডিপ-এ যখন আগুন লাগে তখন ৪২ নম্বর ডিপের এই সাতটি প্রাণী বাঁচার তাগিদে প্রাণপনে রাস্তা খুঁজতে থাকে। শ্রমিকরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার মরিয়া চেষ্টা চালায়। শ্রমিকরা ভাবতে থাকে যে তাদের বাঁচানোর জন্য রেসকিউ টিম নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যায়, ভয়, আতঙ্ক তাদের ক্রমাগত চেপে ধরে। সবাই এতটাই আতঙ্কিত হয় যে তারা আসন্ন মৃত্যুকে যেন দেখতে পায় ও মৃত্যু ভয়ে প্রলাপ বকতে থাকে।

খাদের মধ্যে শ্রমিকরা যখন বেঁচে ফেরার জন্য আকুল চেষ্টা চালাচ্ছে, অবসন্ন শরীরে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে যখন সুড়ঙ্গ কেটে বাইরে বেরোনোর প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন স্বার্থপর লোভী কোম্পানি মানুষের প্রাণকে তুচ্ছ করে লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লাকে বাঁচানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে—

ক্যাপ্টেন।। রিপোর্টের সময় এখনও হয়নি। ঢুকতেই পারছি না বিয়াল্লিশ ডিপে। লোক বেঁচে আছে কিনা কি করে বলবো!

দত্ত।। আগুন লেগে গিয়ে থাকতে পারে।

ক্যাপ্টেন।। আগুন তো লেগেছেই। ধোঁয়ার রং দেখছেন না?

দত্ত।। অত লক্ষ টাকার সম্পত্তি— তাই সেটাকে সেভ করার জন্য—

ক্যাপ্টেন।। আর মানুষের প্রাণ? তাকে সেভ করার দরকার নেই?।[১৯]

কোম্পানির লোকেদের কাছে মানুষের প্রাণের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় অর্থ, তাই সেই অর্থকে বাঁচানোর জন্য তারা সাত সাতটি মানুষের প্রাণকে তুচ্ছ করে খাদের মধ্যে জল ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিস্টার দত্তের নেতৃত্বে ৪২ নম্বর ডিপ-এ জল ছেড়ে দেওয়া হয়—

গফুর।। বেরিয়ে আয় শিগগির। রমজান জল ছেড়ে দিচ্ছেরে, বেরিয়ে আয় রমজান। রমজান রে (চিৎকার করে) তোরা বেরিয়ে আয়, জল ছেড়ে দিচ্ছে। তোরা বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়।

[স্যাপার চাবি ঘোরায়— মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝিলিক মেরে ধরিত্রীগর্ভে বাঁধ ভাঙে। কালো ধোঁয়া আর ধুলোর আস্তরণ সরে যেতে দেখা যায় মা ভয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরেছেন। আতঙ্কে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে শোনা যায় জলের সোঁ সোঁ গর্জন। ধরিত্রীর জঠরে বান ডেকেছে।] [২০]

শেষ দৃশ্যে কয়লা খনির গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া এবং ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া জলস্রোতের মধ্যে ডুবন্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর যে আকুল আর্তি ও মর্মান্তিক লড়াই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে। খনি শ্রমিকদের জীবনের কথা, তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, তাদের সংগ্রামের কথা অর্থাৎ কয়লা খনির শ্রমিক জীবনের এত বাস্তব ও অনুপুঙ্খ ছবি এর আগে বাংলা নাটকে ঘটেনি। উৎপল দত্ত সেটাই করে দেখালেন। তিনি বরাধেমো এলাকাতে বিভিন্ন কয়লা খনিতে ঘুরে তথ্য যেমন সংগ্রহ করেছিলেন তেমনি, খনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বঞ্চিত ও শোষিত অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

কয়লা খনির শ্রমিকরা তখন নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। আর অন্য পক্ষে কয়লাখনির তলার জলে তাদেরই ডুবিয়ে দেওয়া। আগুন লাগা কয়লাখনিতে। এইসব অনেক চমকপ্রদ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই আমরা বরাধেমো এরিয়াতে কয়লাখনি ঘুরে ঘুরে তথ্য-টথ্য সংগ্রহ ক'রে এলাম। নাটক লিখলাম। [২১]

কোম্পানির মালিকদের অর্থলোভ ও স্বার্থপরতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে এবং তারই চক্রান্তে ও শোষণ অত্যাচারে অসহায় দরিদ্র-বঞ্চিত খনি শ্রমিকেরা নিজেদের শেষ করে ফেলে। তার নির্মম নিষ্ঠুর ছবি উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। তিনি শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক পক্ষ নিয়ে পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণির শোষণের স্বরূপ ও মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। এই শোষণ নিপীড়িন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য উচ্চগ্রামে তুলে ধরেছেন। তার জন্য তাঁকে অনেক আক্রমণও সহ্য করতে হয়েছে। শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পক্ষ থেকেও তাঁর নাটকের তথ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে—

'অঙ্গার'কে হিংস্র আক্রমণ করল বড়লোকদের পত্রপত্রিকা। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হয় এ কথা নাকি মিথ্যা। লিট্‌ল্ থিয়েটার নাকি অশ্লীলতার অনুশীলন করছে। এ-দল বাংলা নাট্যশালার পবিত্র ঐতিহ্য নষ্ট করছে। [২২]

শোষিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের করুণ কাহিনি 'তীর' নাটকে উৎপল দত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতি নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নকশালবাড়ি অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালি, রাজবংশী জনজাতি মানুষের শোষিত ও বঞ্চিত অবস্থার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জমিদার জোরদার শ্রেণি কীভাবে কৃষকদের ধান কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে তারা দিনের পর দিন মুনাফা লাভের জন্য চাল মজুত করছে ও দরিদ্র কৃষকদের অভুক্ত ও শোষিত করে রেখেছে তা উৎপল দত্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তথ্য সংগ্রার্থে তিনি নকশালবাড়ি অঞ্চলে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন ও এইসব জনজাতি অর্থাৎ সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাওঁ, নেপালি প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি শুনে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ধনী জোরদার সত্যবান সিং-এর গৃহের প্রাঙ্গন। সেখানে সে তার সহযোগী বৃক্ষ রায়-এর সঙ্গে জমির চাষিদের উপস্থিতিতে হিসাবে বসেছেন। তারা মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে মজুরির বড়ো অংশ মেরে দিচ্ছে, তাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য ধানও আত্মসাৎ করছে। দরিদ্র কৃষকদের সামান্য মজুরি ও শুকনো চিঁড়ের বদলে তাদের দ্বারা অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে নেন, অথচ তারা যখন তাদের প্রাপ্য চাইতে যায় তখন মিথ্যা হিসাবের জালে, মিথ্যা ঋণের ফাঁদে ফেলে তাদের প্রাপ্য তো জোটেই না সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে ঘাড়ের ওপরে চাপে নানারকম ঋণের ভার সঙ্গে জোটে অত্যাচার। হতদরিদ্র কৃষক রণবাহাদুরকে দেখি তাকে মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে পনেরো দিনের মাইনে সত্যবান সিং-এর যোগ্য সহযোগী বৃক্ষ রায় আত্মসাৎ করে ফেলে ধার নেওয়ার অজুহাতে। বরং তার কাছে আরও একশো টাকা পাওয়ার হিসাব দেখিয়ে দেন। জমিদার জোরদার শ্রেণির শোষণের এই বাস্তব ও নির্মম চিত্র উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যতায়।—

বৃক্ষ।। ... এস –বির্সা ওরাওঁ, সানঝো ওরাইন— গত তিন দিনের বাকি আছে, বির্সার দুটাকা করে ছ'টাকা, সানঝোর দেড় টাকা করে সাড়ে চার। নাও— তারপর ওখানে চিঁড়ে আছে, খেয়ে মাঠে যাও—। চটপট, চটপট—

বির্সা।। চাহা দেয়ার কথা ছিল যে? চা, চা—

সত্যবান।। লবণের একান্ত অভাবের দরুণ চাহা পাবে না।...

বৃক্ষ।। শনিচারোয়া ওরাওঁ, বাকি নেই— মাঠে যাও।

শনিচারোয়া।। না, না, বাকি আছে বইকি, দুদিনের চার টাকা।

বৃক্ষ।। খাতায় নেই। রণবাহাদুর থাপা— ...

বৃক্ষ।। রণবাহাদুর থাপা, বাকি নেই!

রণবাহাদুর।। সে কি? পনেরো দিনের মাইনে বাকি। ৩০ টাকা।

বৃক্ষ।। বাঃ, ধান ধার নিয়েছিলে না?

রণবাহাদুর।। ধার নিয়েছিলাম নাকি?

বৃক্ষ।। এই তো— চার বারে আট মণ ধান। আমরাই বরং তোমার কাছে পাবো একশ—।[২৩]

রাজবংশী কৃষক উপাসু সিং যখন জোরদার সত্যবান সিং-এর সহযোগী বৃক্ষ রায়ের কাছে ধানের হিসাব করতে যায় তখন দেখি তার পঁচিশ মণ ধান হাওলাত নেওয়া, খোরাকি নেওয়া, জমিতে গোরুর মজুরি হিসাব বাবদ সবকিছু কেটে নিয়ে তার উপর আবার এগারো মণ ধানের ঋণ চাপিয়ে দেওয়া হয় ভুল হিসাব দেখিয়ে। সহজ-সরল-সাদাসিধে এই কৃষকরা হিসাবের এই ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে পারলেও তারা প্রতিবাদ করতে পারেন না। তাদের মুখ বুজে সব কিছুই সহ্য করতে হয় পেটের দায়ে। এর মধ্যে সাঁওতাল কৃষক গেব্রিয়েল-এর মতো যদি কেউ প্রতিবাদ করে তাহলে তাকে বিভিন্নরকম হুমকি দেওয়া এবং জোরদার-এর খেত থেকে কাজও ছাড়িয়ে দেয় কিংবা কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখায়। এই শোষিত দরিদ্র কৃষকরা পেটের অন্ন সংস্থানের অন্য উপায়ন্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যবান সিং-এর সমস্ত অন্যায় অত্যাচার মেনে নিয়ে আবার তার কাছেই পেটের দায়ে কাজে যোগ দেয়।—

বৃক্ষ।। উপাসু সিং, ধান পাওনা নেই।

উপাসু।। আমি-আমি পুরো পঁচিশ মণই তো জমা দিয়ে গেছি। পঁচিশ মণ লেখা আছে তো?

বৃক্ষ।। হ্যাঁ। তা থেকে বারো মণ গেল গিরির—

উপাসু।। তাহলে আমি পাই তেরো মণ—

বৃক্ষ।। গরুর পানো বাবদ ছ'মণ কাটা গেল—

উপাসু।। তবু থাকে সাত—

বৃক্ষ।। আর ভুতা? তোমার খোরাকি? তাতে গেল ছ'মণ—

উপাসু।। [ক্রমশ হতাশ] তবু থাকে— এক—

বৃক্ষ।। আর হাওলাৎ নিয়েছিল বারো মণ ধান; তাহলে—

উপাসু।। তাহলে আমি পাচ্ছি না, আপনারা পাবেন এগারো মণ এই তো?

বৃক্ষ।। হ্যাঁ।

উপাসু।। জানতাম! ... সারা বছর খেটে ধান তুললাম, এখন ভেদেংগা চাষীর হিসেবে সে তো নেই ই। আরো ১১ মণের ঋণ শূন্য থেকে এসে চাপলো স্কন্ধে।...

বৃক্ষ।। গেব্রিয়েল, চারদিনের বাকি আট টাকা।

গেব্রিয়েল।। না, পাঁচ দিনের দশ টাকা।

বৃক্ষ।। খাতায় লেখা আছে।

গেব্রিয়েল।। খাতায় ভুল লেখা আছে।

বৃক্ষ।। না ভুল নেই।

গেব্রিয়েল।। তাহলে জোচ্চুরি করা আছে।

বৃক্ষ।। কী বললে?

গেব্রিয়েল।। ইচ্ছে করে মিথ্যে লিখে ঠকাবার চেষ্টা করছেন। সোমবার থেকে টাকা দেয়নি। আজ শনিবার। পাঁচ দিন হয়।

বৃক্ষ।। সাবধান গেব্রিয়েল!

গেব্রিয়েল।। আপনি আরো সাবধান, বৃক্ষবাবু!

বৃক্ষ।। এই রবিরাম! ধর তো ব্যাটাকে—

গেব্রিয়েল।। তীর মেরে বুকে ছ্যাঁদা ক'রে দেব, বৃক্ষবাবু, বেশি যদি খচরামি করেন। টাকা দিন।

সত্যবান।। দিয়ে দিন। ওকে আর দরকার নেই। আজ থেকেই ও যেন অন্যত্র কাজ দেখে। [২৪]

আর এক হতদরিদ্র কৃষক শুক্রা টুডু। তার যখন হিসাবের ডাক পড়ে এবং তার প্রাপ্য একদিনের মজুরি দু'টাকা নেওয়ার জন্য সত্যবান সিং-এর সাক্‌রেত বৃক্ষ রায় বলে তখন সে তাদের হিসাব-নিকাশকে ব্যঙ্গ করে এবং একদিনের প্রাপ্য মজুরি দু'টাকা নিতে অস্বীকার করে।—

বৃক্ষ।। শুক্রা টুডু একদিনের বাকি— দুটাকা।

শুক্রা।। হতে পারে না— এ হতে পারে না— কিছুতেই হতে পারে না—

বৃক্ষ।। লেখা আছে— এই দেখ, দু টাকা তার বেশি কি করে হবে, কারণ—

শুক্রা।। বেশি নয়! বলছি, দু টাকা আমি পেতে পারি না।

বৃক্ষ।। [থতমত খেয়ে, খাতা দেখে] না... দু টাকা পাবি এই যে—

শুক্রা।। নিশ্চয়ই ধার আছে। কেটে নিন। কেটে নিন।

বৃক্ষ।। ধার নেই তোর-এই তো-

শুক্রা।। তাহলে আমার বাপের ধার ছিল!। [২৫]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করল। দেশের আপামর কোটি কোটি জনগণ স্বপ্ন দেখল নতুন সরকার তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু নেহেরুর নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমূলে নির্মূল করে দেয়। অচিরেই দেশের সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে যে ভারতবর্ষের সরকার আসলে বিদেশি পুঁজির সরকার, তারা বিদেশি পুঁজির সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারের নতুন নতুন নীতি নির্ধারণ, নতুন নিয়ম প্রণয়ন সবই মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জমিদার-জোতদার শ্রেণিরা ও এক শ্রেণির মুনাফাবাজ মানুষ নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমাগত বর্ধিত করে তুলেছে। মুনাফাবাজ জমিদার-জোতদারদের জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে পুলিশি অত্যাচার-জুলুমের দ্বারা স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে পদদলিত করা হয়, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সুদ ও করের হ্রাসের দাবি, জমির দাবি প্রভৃতির জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামগুলোকেও নির্বিচারে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ভারবর্ষের প্রেক্ষাপটে এহেন অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ত্রতন্ত্র বিরোধী শক্তির বিকল্প হিসেবে জনমানসে শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের সহায়সম্বল হয়ে ওঠে। কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বন্টন, কর মকুব, বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও শিল্পায়ণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার কথা বলে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আস্থা অর্জন করতে থাকে। এক সুস্থ-সুন্দর গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখাতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক শ্রেণির উন্নত জীবনযাত্রা, দেশ থেকে বেকার দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। জমিদার-জোতদার, মজুতদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে সমবেত করার প্রচেষ্টা

করতে থাকে, পুঁজিবাদ বিরোধী নানা কার্যকলাপে তারা অংশগ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এইসব বিভিন্নরকম কর্মসূচি আপামর মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্বাধীনতা আসার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে কিছুটা অতি বাম হটকারী বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণ লক্ষ করা গেল। তেলেঙ্গানা আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করল ফলে পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। কার্যকলাপ-সংগঠন প্রভৃতিও ব্যাহত হল। সরকার মদতপুষ্ট প্রশাসনের পাশাপাশি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রাণহানি, হেনস্থা সবই ঘটতে থাকল। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘ তারও তখন খুবই দুরাবস্থা। আবার কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের ভিতরেও কর্মীদের মধ্যে নানারকম মতভেদ তৈরি হচ্ছিল। এইসব নিয়ে গণনাট্য সংঘের মধ্যেও নানা মতানৈক্য দেখা দিল। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে অনেকেই বেরিয়ে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নাট্যদল তৈরি করে নাটক অভিনয় শুরু করলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এসে তৈরি করলেন 'বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী'। 'বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী' প্রথমদিকে তারা গণনাট্য প্রযোজিত নাটকগুলোই করতে লাগলেন, বা সেইরকম ভাবনার নাটকই শুরু করলেন 'ছেঁড়া তার', 'পথিক', 'নবান্ন' প্রভৃতি। কিছুদিন পরেই দুটি শিবির আলাদা হয়ে গেল। গণনাট্য সংঘে যারা থাকলেন তারা নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী নাটক করতে থাকলেন। গণনাট্য থেকে যারা বেরিয়ে এসে নিজেদের মতো নাটক করার চেষ্টা করলেন, কংগ্রেস সরকার তাদেরকে স্বাগত জানাল। কেউ কেউ এদের নাট্য প্রয়োজনার প্রচেষ্টাকে আরেকটা নবতর আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করে দিলেন— যার নাম দেওয়া হল 'নবনাট্য আন্দোলন'। শম্ভু মিত্রকে ওই শিবিরের প্রধান হিসেবে বরণ করে নিলেন। রাজনৈতিক নাগপাশ (কমিউনিস্ট পার্টির) থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পের প্রতি গুরুত্ব তাদের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়াল। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতি মুক্ত নাট্যচর্চা করতে থাকায় সরকার তাদের বিপুল অর্থ ও সম্মান প্রদান করলেন। নতুন নাট্যদল বৃহৎ শাসন ও শোষণের সপক্ষে কথা বললেন। অর্থাৎ শাসকের হয়ে কথা বলা তদানীন্তন সরকার রাজনীতি মনে করতেন না। শাসকের ঘুমভাঙার এই প্রচেষ্টাকে রাজনীতি হিসেবে ধরে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এক পুলিশি ফতোয়া জারি করে গণনাট্য সংঘের ঊনষাটটি নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করলেন। প্রচার শুরু করলেন গণনাট্য সংঘের কমিউনিস্ট কর্মীরা শিল্পে রাজনীতির প্রবেশ করিয়ে রাজনীতি করছে। তাই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা,

সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা নাটকের অভিনয়গুলো বন্ধ করলেন। স্বাধীন দেশে এমন কিছু কিছু নাটক প্রযোজিত হচ্ছিল যে, স্বাধীন সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্তে থাকা যাচ্ছিল না। তদানীন্তন কংগ্রেসি সরকার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষদের স্বার্থহরণকারী যে কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল তা গণনাট্য সংঘের নাট্যকাররা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা সরকারের মুখোশ খুলে জনতার দরবারে উন্মোচন করতে শুরু করেছিলেন। ফলস্বরূপ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল গণনাট্য সংঘের নাট্যকারদের এবং নাটকগুলিকেও।

১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ডামাডোল অবস্থা, সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতের নানা উত্থান-পতনের অবস্থায় উৎপল দত্তের নাট্য জগতে প্রবেশ। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কলেজে তখন তিনি ছাত্র, সেই সময় কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। শেকসপিয়রের নাটকে অভিনয় দিয়ে তাঁর শুরু। ক্রমশ শেকসপিয়র থেকে বার্নাড শ', বার্নাড শ' থেকে ক্লিফোর্ড অডেটস-এর লেখা বিখ্যাত বিখ্যাত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। শেকসপিয়েরর নাটকে অভিনয়ের সময় (জুলিয়াস সিজারও) উৎপল দত্ত সিজার ও তার অনুচরদের যে ফ্যাসিস্ট আচার-আচরণ ও পোশাক সেগুলো অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন—

> *পরের নাটক আধুনিক পোশাকে 'জুলিয়াস সিজার'। আধুনিক বলতে ফ্যাসিস্ত ইটালিয় উর্দিতে। ইংরেজি নাটক কলকাতা শহরে যতটা আলোড়ন তুলতে পারে এ-নাটক তুলেছিল। শেক্স্পিয়ারের একটি অক্ষর পরিবর্তন না করেও একটি অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠেছিল সিজার।* [২৬]

জর্জ বানার্ড শ'-এর রাজনীতি ভাবনার নাটকগুলিতে যে রাজনীতি ধরা পড়েছে সেগুলোকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন। আবার ক্লিফোর্ড অডেট্স-এর নাটক ইউরোপের নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের নাটক; সেই রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে উৎপল দত্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। কাকদ্বীপে নারী হত্যা, কারাগারে নির্বিচারে গুলি চালানো, নয়ানপুরে লাল মাটি, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের অনুষ্ঠানে গুলিবর্ষণ, ময়দানে হাজরাপার্কে জনসমাবেশে বেপরোয়া গুলি চালানো, বউবাজারে নারী মিছিলে গুলি প্রভৃতি নৃশংস ঘটনা যখন একের পর এক ঘটতে থাকে তখন গণনাট্য সংঘ ক্লিফোর্ড অডেটস-এর বিপ্লবী নাটক "Till the Day I Die" অভিনয় করেন। ইউরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে কলকাতার ভারতীয় কমিউনিস্টদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন—

> *নিষিদ্ধ এক কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী ওডেট্স-এর 'টিল দা ডে আই ডাই' হল আমাদের পরের নাটক। জর্মন পার্টি বীরত্ব গাথা ৪৯-এর কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের আত্মবলির কাহিনী হয়ে উঠেছিল।* [২৭]

এইভাবে রাজনৈতিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার প্রস্তুতি নিয়ে, উৎপল দত্ত ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘ তাঁকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা আলোকিত জাগরণে মেতে উঠলেন তিনি। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নাটক ও পথনাটক করতে শুরু করলেন, কোনটা অভিনেতা হিসেবে, কোনটা আবার পরিচালনা করলেন। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাজনীতির সঙ্গে ক্রমশ অভিজ্ঞ হতে থাকলেন—

> *রাজনীতি কত যে শিখেছি, তাঁদের কাছে হ্যারিকেন-জ্বালা রাত্রের অস্পষ্ট মায়ায়, তা বোধহয় তাঁরা নিজেরাও জানেন না। পরদিন ভোর থেকে আবার টহল— হেঁটে, লরিতে, জগদ্দলের মতন এক বিস্ফোরক মোটরগাড়িতে। বাটা কারখানার গেটে, নুংগিতে, বজবজে, দশ বারো মাইল দূরের গাঁয়ে, মহেশতলার প্রতি পথের মোড়ে।* [২৮]

সেইসময় অনেক নাট্যশিল্পী রাজনীতির ছ্যুৎমার্গে গণনাট্য সংঘকে পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এইভাবে প্রায় দশমাস গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎপল দত্ত নিজের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাকে ভালোভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *মোট দশ মাস গণনাট্যে। কিন্তু এই দশ মাসে যা সঞ্চয় করেছি তার তুলনা কোথায়?* [২৯]

রাজনৈতিক টালমাটাল, বাংলা নাট্যজগতের দিশাহীন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত থিয়েটারের কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন, থিয়েটারের কাজটা হবে আপাদমস্তক মতাদর্শগত। তিনি লক্ষ করেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা তার বিকাশ ও ব্যাপ্তি এই মতাদর্শগত চিন্তারই প্রতিফলন। একটা সময় থিয়েটার মানেই ছিল বাবুবিলাসের পরিপন্থী, উৎপল দত্ত গণনাট্য আন্দোলনেই প্রথম থিয়েটারকে বাবুবিলাসের কক্ষ থেকে সরিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন একেবারে আমজনতার মাঝখানে তিনি তাঁর লেখায়, কথায় শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নায়ক হিসেবে মঞ্চে হাজির করেছেন। শিল্প-সংস্কৃতিকে সমাজ বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক চিন্তা, প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছেন তরবারির মতো। উৎপল দত্তই বাংলার প্রথম নাট্যকার, যিনি সরাসরি বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতিকে তাঁর সমগ্র রচনায় স্থান দিয়েছিলেন। অন্যান্য নাট্যকারদের মতো বিভিন্ন নাটক রচনার ফাঁকে রাজনীতি বিষয়ে নাট্য রচনা করেননি। বলা যেতে পারে রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু উৎপল দত্তের সমগ্র নাট্যকার সত্তার প্রাণ ভোমরাস্বরূপ।

উৎপল দত্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বদাই ছিলেন মার্কসবাদী। সেই মার্কসবাদী

চিন্তাধারাকে থিয়েটারে সফলভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেই চিন্তায় কখনো বিচ্যুতি ঘটলেও তা দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করেছেন এবং মার্কসবাদের প্রতি আদ্যন্ত বিশ্বাসে কখনোই বিচলিত হননি। তাঁর সময়সাময়িক বা নিকট বা দূর অতীতের রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্য রচনা করেছেন এবং তা সর্বদা মার্কসবাদী চিন্তাধারার আলোকে। তাঁর নাট্যদলের উপরে কখনো শাসকবর্গের অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ, ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম হেনস্থা ও হাজতবাসকে সঙ্গী করতেও পিছুপা হননি। রাজনৈতিক ভাবনার জগৎ থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি নানারকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও। সমসাময়িক বিষয়কে রাজনীতিতে নিয়ে আসায় শাসক শ্রেণির দ্বারা ও বিরোধী শ্রেণিশত্রুর আক্রমণ, হামলা, অত্যাচারে কখনোও ভীত হননি। শ্রেণিশত্রুর মুখোশ উদ্‌ঘাটন করতে ও তাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে সদা সর্বদা নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন।

উৎপল দত্ত দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিলও হয়েছেন এবং সে আন্দোলনের দাবিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পথনাটক রচনা করেছেন, অভিনয় করেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কখনো মার্কসবাদ থেকে তিনি দূরে সরে যাননি। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটকে জড়িত করেই তিনি তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক নাটক রচনা করেছেন। তাই তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা শুনতে পাই—

> *যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি যুক্ত থাকতে পারব না সেদিন থেকে আমার শিল্প সত্তারও মৃত্যু ঘটবে।*[৩০]

অতীতের ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে এদেশের ঘটনার ব্যাখ্যা করে, বর্তমানের সমাজ দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে কিংবা বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি এনে তিনি তাঁর নাটকে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়, সর্বহারার দৃষ্টিতে সর্বহারার মানবতাবাদই উৎপল দত্তের নাটকের প্রধান ঘটনাবলি। তাই তিনি সমাজকে ও শ্রেণি বিভক্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মার্কসবাদের বিচার ধারায়। মার্কসবাদী ভাবধারা আদর্শ বহন করতে গিয়ে সমকালীন সময়ের শাসক শ্রেণির কাছ থেকে নানা আঘাত, নিন্দাবাদ, প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সেই সঙ্গে গুণ্ডা-বদমায়েশেরা নানারকমভাবে তাঁর শারীরিক নির্যাতন ও আঘাত করেছে।

উৎপল দত্ত বিষয় ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আঙ্গিকের প্রতিও সদা সর্বদা সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন ও নাটকের আঙ্গিকও মার্কসবাদী চিন্তায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি সবসময় মনে করতেন নাটকের বিষয়বস্তু হবে আন্তর্জাতিক মানের এবং অবশ্যই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই

সঙ্গে নাটকের আঙ্গিক হবে সম্পূর্ণ দেশীয় ও জাতীয় আঙ্গিকে নির্মিত। মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সদাসর্বদা সামঞ্জস্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্বাচন করেছিলেন।

উৎপল দত্ত তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে তাঁর নাট্যকর্মে ও বাস্তব জীবনে ধারণ ও বহন করে গেছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। উৎপল দত্তের নাটকীয় দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। কার্ল মার্কসের চিন্তাভাবনা, ন্যায়-নীতি, জ্ঞান-দর্শন প্রভৃতিকে মার্কসবাদ বলে। কাল মার্কস প্রথম জীবনে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তারপর ইতিহাস আর দর্শন পড়বার দিকে ঝোঁক তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত দার্শনিক গবেষণার দরুন তিনি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করলেন এবং স্থির করলেন দর্শনের অধ্যাপনাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু অধ্যাপনা তাঁর করা হয়ে উঠল না কারণ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দার্শনিক মতাবর্ত্তা কোনোভাবেই নিরাপদ ছিল না। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মার্কস অধ্যাপনার আশা ছেড়ে দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াই মনস্থির করলেন, কারণ সেই সময় সমগ্র জার্মানিতে রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব সরকারি এক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। ক্রমে সরকারের চাপে মার্কসের সম্পাদিত পত্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধ জারি হয় এবং পত্রিকাটিকে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কাল মার্কস জার্মানি ছেড়ে প্যারিসে চলে যান। সেখানে পরের বছর ঘটনাক্রমে ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও বন্ধুত্ব হয় যা কাল মার্কসের জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত অটুট ছিল।

এঙ্গেল্‌স্ একান্তভাবেই কাল মার্কসের সহকর্মী হয়ে উঠলেন, দুজনে মিলে একসঙ্গে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করা, একসঙ্গে আন্দোলন করা, এমনকি একসঙ্গে বই লেখাও চলতে থাকল তাঁদের। মার্কসবাদের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্—এই দুজনে মিলে লেখা। অবশ্য অনেকগুলি শুধুমাত্র এঙ্গেল্‌স্-এর লেখা। মার্কসবাদে কার্ল মার্কস-এর পাশাপাশি ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্‌স্-এর অবদান ও অনস্বীকার্য, তাই এঙ্গেল্‌স্-এর অবদান সম্বন্ধে খেয়াল রাখবার জন্যই পরবর্তীকালে লেনিন মার্কসবাদের নাম দিয়েছেন— 'মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ মার্কসবাদ'।[৩১] ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কস আর এঙ্গেল্‌স্ দুজনে একসঙ্গে 'কমিউনিস্ট লীগ' বা সাম্যবাদী সংঘ নামক এক গোপন সমিতির সদস্য হন। এই সমিতির কাজকর্মের সঙ্গেও দুজনে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েন এবং ক্রমশ সমিতি পরিচালনার প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেন। এই সমিতির তাগিদে দুজনে মিলে একসঙ্গে রচনা করেন 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' বা সাম্যবাদীর

ফতোয়া। এই ফতোয়াই সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক রূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল। দীর্ঘ বছর ধরে একটানা অমানুষিক মেহনত করে পৃথিবীর সেরা সেরা পাঠাগার উজাড় করে পুথি সংগ্রহ করে লিখলেন 'ডাস ক্যাপিটাল' বাংলা করলে দাঁড়ায় 'পুঁজি' বা 'মূলধন'। 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড লেখার জন্য অগাধ মালমশলা জোগাড় করেছিলেন কার্ল মার্কস। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লিখে শেষ করা তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটার কারণে। তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লিখে শেষ করার কাজ এঙ্গেল্‌স্‌-এর উপর বর্তায় এবং 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড এঙ্গেল্‌স্‌ই শেষ করেন।

মার্কসবাদ হল বিজ্ঞান, কোনো মহাগুরুর অমৃতবাণী নয়। বিজ্ঞানের মতো মার্কসবাদেও দিনের পর দিন উন্নতি, অগ্রগতি ও নতুন নতুন আবিষ্কার। তাই মার্কস যা লিখেছেন, যা ভেবেছেন, যা বলেছেন শুধু সেইটুকুকে স্মৃতি মতো আঁকড়ে ধরতে যাওয়া মার্কসবাদ অনুমোদন করে না; কেন-না, মার্কসবাদে কোনোরকম সনাতন চিরন্তন সত্যের স্থান নেই। আসলে মার্কস কতগুলো মূল সূত্র দিয়ে গিয়েছেন, মার্কসবাদীদের দায়িত্ব কর্তব্য হল সেই মূল সূত্রগুলিকে পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে প্রয়োগ করা। লেনিন তাঁর সময়কার পৃথিবীকে মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলো অনুসারে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলেন এবং তার সময়কার রাশিয়ার অবস্থার উপরে মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কসবাদের সূত্রগুলি লেনিন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলেই মার্কসবাদে লেনিন-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, এবং মার্কসবাদেও দেখা গেল অগ্রগতি ও রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতি। লেলিনের পরে স্তালিন। স্তালিনের সময় পৃথিবীর অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি আরও বদল ঘটে। স্তালিন নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন এবং মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে লেনিনের অবদানকে স্পষ্টভাবে মাথায় রেখে সেই নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির উপরে মার্কসবাদের সূত্রগুলোকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন ও মার্কসবাদকে গড়ে তুললেন আরও সমৃদ্ধভাবে। তারপর মাও-সে-তুঙ, ইনি মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটান চীনের ওপর। ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় চীন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম, মাও-সে-তুঙ সেই পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবগত হয়েও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদের সূত্রগুলির প্রয়োগ করলেন। মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগ করে মাও-সে-তুঙ চীনের ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের ইতিহাসেও নতুন অবদানের স্বাক্ষর রাখলেন।

মার্কসবাদের মূল কথা হল জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, মাথা খাটানোর সঙ্গে গতর খাটানোর

একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা চাই। এই সম্পর্ক ভেঙে গেলে জ্ঞান হবে বৃথা জ্ঞান। মানুষ যদি চোখ বাঁধা বলদের মতো শুধু গতর খাটায়, যদি তার কর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও চেতনার যোগাযোগ না থাকে তাহলে তার শ্রমটুকু হবে অনর্থক, নিষ্ফল। তাই একপিঠে জ্ঞান আরেকপিঠে কর্ম, কর্মকে বাদ দিলে জ্ঞান হবে পঙ্গু, বন্ধ্যা। একইরকমভাবে জ্ঞানকে বাদ দিলে কর্ম হবে অন্ধ-অর্থহীন। সব জিনিসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য, তা সমাজতত্ত্বের বেলাতেও, আবার রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কৃষক-শ্রমিক শ্রেণিরা সদাসর্বদা অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই জগতকে বোঝা সম্ভব এবং তা বুঝে তাকে পরিবর্তন করাও সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো আবিলতা থাকে না, কারণ তার শোষিত বিপর্যস্ত নিপীড়িত অবস্থা। শ্রমিক শ্রেণি মানসিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে কখনোই তাদের অতীতের কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে চায় না, বহির্বিশ্বের দিকে তাদেরকে তাকাতেই দেওয়া হয় না। শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই বোঝে যে সে নিজেই একটা পণ্য। সে বোঝে তার শ্রমশক্তিও একটা বাণিজ্যের বস্তু। তাই বুর্জোয়া দার্শনিক পরিবর্তনশীল জগতকে দেখতে পান না, কিন্তু শ্রমিক নিজেকে চেনার মাধ্যমেই জগতের স্বরূপ বুঝে ফেলে—

> *তার চেতনা হচ্ছে বাণিজ্যপণ্যের আত্মচেতনা, অর্থাৎ তাঁর চেতনার পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ তার পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময় সমেত উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।* [৩২]

শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই বিশাল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার অংশ এবং তারা উৎপাদনের একটি মুহূর্ত মাত্র। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণি বিশ্বকে অচল-স্থির হিসেবে দেখতে পারে না, তারা সর্বদা বিশ্বকে প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত। চলমান জগৎ এইভাবেই তার চেতনায় প্রবেশ করে, কারণ প্রক্রিয়া মানেই পরিবর্তন, যেমন লৌহ আকর থেকে ইস্পাতের বিমে পরিবর্তন হয়, বৃক্ষের কাষ্ঠ থেকে আসবাবপত্রে পরিবর্তন হয়, সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ থেকে নিঃস্ব শ্রমিকে পরিবর্তন হয়। উৎপল দত্তের স্পষ্ট মতামত—

> *শ্রমিকের মতাদর্শই তাই সত্যে পৌঁছায়। দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তন করাও সম্ভব। ... সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।* [৩৩]

মার্কসবাদের সবকথাই হল মেহনতকারী মানুষের তরফের কথা। মেহনতকারী মানুষই

আগামী দিনে নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে, নতুন ইতিহাস লিখবে। কার্ল মার্কসের চিন্তা-চেতনায় ও বিচার ধারায় একটা জিনিস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল যে পুঁজিবাদী সমাজের পরমায়ু অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে ও এমন অশুভ শক্তির জন্ম দিচ্ছে যার ফলে নিজেরাই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতকারী মানুষদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে না, কারণ ইতিহাসে আপনা আপনি কিছুই হয় না, মানুষই ইতিহাস বদলায়, মানুষই তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে একটা নতুন যুগ গড়ে তোলে। সেই নতুন যুগ গড়ে তোলার পিছনে সর্বাগ্রে অবদান অনস্বীকার্য এই মেহনতি মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষদের। আগামী দিনের সমাজ কীভাবে গড়ে উঠবে, আগামী দিনের ইতিহাস কীরূপে লেখা হবে, তা সবই নির্ভর করে এই মেহনতি মানুষের শ্রমের উপর। কার্ল মার্কস মনে করেন তাই সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়তে হলে, মেহনতকারী মানুষদেরই এগিয়ে আসতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, জনতার দায়িত্বকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। কার্ল মার্কস নিজের জীবদ্দশায়ও একইরকম কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রণী ছিলেন।

দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা তা শুধুমাত্র পণ্ডিতদের মহলে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনে একটা না একটা দার্শনিক মতবাদ মানুষকে বেছে নিতেই হয়। মানুষ পৃথিবীকে যেমনভাবে দেখে বা পৃথিবীকে যেমনভাবে বুঝে নিয়েছে, মানুষের জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা দার্শনিক মতবাদ মেনে নেয়। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই একটা না একটা এই দার্শনিক মতবাদ থাকে। তাই কোনো মানুষের পক্ষে দার্শনিক মতবাদ ছাড়া চলা একপ্রকার অসম্ভব। যেমন জগতকে স্বীকার করলে একপ্রকার মতবাদ, আবার জগতকে যদি নাও স্বীকার করা হয় সেটাও একপ্রকার দার্শনিক মতবাদ। একটা না একটা দার্শনিক মতবাদকে আধার করে মানুষ এগিয়ে চলে। এই দার্শনিক মতবাদ বাছাই করবার ব্যাপারে মানুষকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়, নইলে এমন কোনো দার্শনিক মতবাদ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে বিফলে চালিত করে। মার্কসবাদ সদাসর্বদা মেহনতকারী মানুষের উন্নতির কথা, সার্বিক মঙ্গলের কথা বলে থাকে, তাই মার্কসবাদ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কখনোই উদাসীন থাকতে পারে না। মার্কসবাদ প্রশ্ন তোলে, প্রচলিত বিভিন্ন যে দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে কোন মতবাদটি সঠিক? যে মতটাকে মানা হবে সেটা কেন ঠিক? মার্কসবাদ বলে, দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে যেটা ঠিক অর্থাৎ যে দার্শনিক মতবাদ মেহনতকারী জনতাকে সমৃদ্ধির পথে, উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাকে গ্রহণ করতে হবে আর যে দর্শন ভাবনা বা দার্শনিক মতবাদ মেহনতকারী মানুষের মনকে পঙ্গু করে রাখে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে মার্কসবাদ অকপটে প্রশ্ন রাখে, শ্রমজীবী

মেহনতকারী মানুষের মন পঙ্গুকারী যে দার্শনিক মতবাদ এগুলো দ্বারা কাদের সুবিধা হয়? এই মতবাদগুলি প্রচার করে সমাজ থেকে কোন শ্রেণির মানুষরা কীভাবে সুবিধা গ্রহণ করে? মার্কসবাদের একটা বিশেষ অঙ্গ হল এই দার্শনিক আলোচনা। মার্কসবাদ সেই দার্শনিক মতবাদটাকেই গ্রহণ করে, যা শ্রমজীবী মেহনতকারী মানুষকে শত অত্যাচার ও অন্যায়ের মোকাবিলা করে বাঁচবার খোরাক জোগায়। মার্কসবাদ সেই দার্শনিক মতবাদটাকেই গ্রহণ করে, যা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে; তাই—

> *মার্কসবাদের একদিকে তাই দার্শনিক আলোচনা। যে-দার্শনিক মতবাদ মার্কসবাদীর কাছে শুধু অভ্রান্ত নয়, মেহনতকারী মানুষকে বাঁচাবার খোরাক জোগায়, সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে, সেই দর্শনের আলোচনা। তারই নাম মার্কসীয় দর্শন।* [৩৪]

মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে রাজনীতির দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশ, কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যারা দেশ শাসন করেন তাদের নীতি নৈতিকতা সদা সর্বদা মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনেতাদের নীতি হতে হবে সদা সর্বদা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে। সেই সঙ্গে ভালো করে জানতে হবে ও বুঝতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির কথাও। সেইসব দেশে রাষ্ট্রনেতাদের নীতি নৈতিকতা কেমন? সেই রাষ্ট্রনেতারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নীতি নৈতিকতা প্রণয়ন করেছে? তাদের দেশ শাসনের সঙ্গে আমাদের দেশ শাসনের, তাদের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের রাজনীতির সম্পর্ক কেমন, সেটাও জানতে হবে। সেইসব দেশের সম্পর্কের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক, তাতে মেহনতকারী মানুষের স্বার্থরক্ষা হয় কিনা তা জানতে নির্দেশ দেয় মার্কসবাদ। অন্য দেশের নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের নীতি-নৈতিকতার যে সম্পর্ক তাতে যদি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা না হয় তাহলে কেমন সম্পর্ক হলে মেহনতকারী মানুষের স্বার্থচরিতার্থ হবে, তা জানা ও বোঝা দরকার। সেই রাজনৈতিক কথাগুলি জানার সঙ্গে যদি মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ না হয় সেই সঙ্গে উক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ককে বা রাজনীতিটাকে বদল করার কথাও বলে মার্কসবাদ। বর্তমান দিনে আমাদের ঘরে বাইরে দেশ শাসনের যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেই ব্যবস্থা যদি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে তাকে বদল করতে হবে, তাকে ভেঙে নতুনভাবে গড়তে হবে, গ্রহণ করতে হবে অন্যরকমের ব্যবস্থা। মার্কসবাদ অনুযায়ী কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শ্রমজীবী মানুষকে সামনে রেখে প্রণয়ন করলে সে দেশ সদা সর্বদা ও সর্বাগ্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। মার্কসবাদ মেহনতি মানুষদের দেশ, বাসস্থান ও রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করে—

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনীতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির পরিচালক শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে, নিজেকেই হয়ে উঠতে হবে জাতি, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়। [৩৫]

নিজের দেশের রাজনীতিকে যেমন আলাদাভাবে জানতে হবে, যেমন চিনতে হবে সেই সঙ্গে অন্য সব দেশের রাজনীতির সঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে স্পষ্ট এক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর সেই দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বোঝার ভিত্তিতেই এগিয়ে চলতে হবে।

মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে অন্যতম হল, অর্থনীতি নিয়ে গভীর ও তাত্ত্বিক আলোচনা। অন্যসব দিকের তুলনায় অর্থনীতির উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়, কারণ কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল এই অর্থনীতি। মার্কসবাদী বিচার অনুসারে অর্থনীতি হল ধন উৎপাদনের কায়দাকানুন চাল-ডাল-গম-গামছা-শাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যান্ত্রিক গাড়ি থেকে হাওয়াই জাহাজ পর্যন্ত সবই মানুষ তৈরি করে অর্থাৎ উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদনের কায়দা কানুনটা সবসময় একরকম হয় না। যেমন— কাপড় উৎপাদন করার সময় তাঁত বুনে করা যায় আবার কলকারখানায় যন্ত্র দ্বারাও উৎপদান করা যায়। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে। এইসব ব্যাপার নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা আর মার্কসবাদ এই আলোচনার মাধ্যমে বিচার করে দেখায় অর্থনীতির রকমফের নির্ভর করে এইসব ব্যাপারগুলোর উপরে। মানব সভ্যতার যা কিছু কীর্তি, তা সবই শেষ পর্যন্ত এই অর্থনীতির উপরে নির্ভর করে। অর্থনীতিই হল শেষপর্যন্ত সব কিছুর চরম ভিত্তি, সেটা শিল্প হোক, সাহিত্য হোক, আইন, ধর্ম, দর্শন সবকিছুর পিছনেই অর্থনীতির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত। আর এই অর্থনীতি সর্বদেশে সদাসর্বদা পরিচালিত হয় কতিপয় কিছু মানুষের দ্বারা। কার্ল মার্কস বলেছেন—

যে অর্থনৈতিক কাঠামোয় অল্প কিছু মানুষ বহু লোকের উপর আধিপত্য চালায়, ধনতন্ত্র কখনই তার বাইরে যায়নি। ধনতন্ত্র কেবল দাস/দাস-মালিক এবং বাঁধা-শ্রমিক/সামন্ত-প্রভু বিভাজনের জায়গায় একটা নতুন বিভাজন নিয়ে এসেছে। এই ব্যবস্থাতেও সংখ্যায় অল্প কিছু লোক আধিপত্য বজায় রাখলেন, বজায় থাকল তাঁদের শোষণও, কেবল তাঁদের একটা নতুন নাম হল : নিয়োগকর্তা।

অন্য দিকে, অধিকাংশ মানুষ আধিপত্যের শিকার, শোষণের শিকার থেকে গেলেন, তাঁদেরও একটা নতুন নাম হল : নিযুক্ত কর্মী। দাসব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের মতোই ধনতন্ত্রেও সংখ্যায় অল্প ক্ষমতাবানরাই সমাজে আধিপত্য বজায় রাখলেন, এবং রেখে চলেছেন। নিয়োগকর্তারা রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, সামাজিক উন্নয়নের লাগামও তাঁদের হাতে। কাজের জায়গায় সমস্ত

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তাঁরাই ঠিক করেন। তাঁরাই সবকিছু চালান। জনসাধারণ তাঁদের আধিপত্যেই থাকেন। [৩৬]

অর্থনীতি এবং রাজনীতি পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে রাজনীতির জন্ম অর্থনীতি থেকে। মার্কসবাদ বিচার করে দেখায়—

অর্থনীতি থেকেই রাজনীতির জন্ম, অর্থনীতির শক্তিই রাজনীতি নিয়ে ভাঙাগড়া করে। কিংবা মাও-সে-তুঙ যেরকম বলেছেন, রাজনীতি আসলে অর্থনীতিরই ঘনীভূত বিকাশ। [৩৭]

অর্থনীতির থেকে রাজনীতির জন্ম হলেও অর্থনীতিকে অদলবদল করার ক্ষেত্রে রাজনীতির গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ করলে বা বিচার করলে খুব পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারা যায় কীরকমভাবে রাজনৈতিক চাপে অর্থনীতির বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। শুধু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে নয়, বিদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অর্থনীতিকে অদলবদল করার ক্ষেত্রে রাজনীতির গভীর প্রভাব বর্তমান। আবার একই রকমভাবে দেখা যায় অর্থনীতির চাপে দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায়। সেটা আমাদের দেশে যেমন প্রযোজ্য, অন্যসব দেশের ক্ষেত্রেও একইরকমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অর্থনীতির কথা বাদ দিয়ে রাজনীতির আলোচনা করা যায় না, উভয় উভয়ের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বীত।

কোনো রাষ্ট্রের অর্থনীতি নির্ভর করে শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতার উপরে। রাষ্ট্র, সমাজের অগ্রগতি শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে ত্বরান্বিত হয়। সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমের দাম রূপে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করা হয়। এভাবেই মানুষ শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে। মার্কসবাদে শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন ও মজুরি, মুনাফা, জোগান ও চাহিদা, মজুরি ও দাম, মূল্য ও শ্রম, বিভিন্ন অংশে উদ্বৃত্ত মূল্যের বাটোয়ারা, মুনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মজুরি সম্পর্কে ইংরেজ শ্রমিক জন ওয়েস্টান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সামনে মতামত প্রকাশ করেন যে—

উচ্চতর মজুরি মজুরদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে না এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতে হবে। [৩৮]

ইংরেজ নাগরিক ওয়েস্টান-এর যুক্তি আসলে নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপরে : প্রথমত, জাতীয় উৎপন্ন পণ্যের পরিমাপ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বস্তু, গণিতবিদরা যাকে বলেন স্থির রাশি বা পরিমাপ।

দ্বিতীয়ত, আসল মজুরির পরিমাপ অর্থাৎ তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কেনা যায় তার হিসেব মাপা মজুরির পরিমাণ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রাশি, একটা স্থির পরিমাণ। এই দুটি বিষয়ই ছিল নাগরিক ওয়েস্টানের মূল যুক্তি ও যুক্তির ভিত্তি। কার্ল মার্কস, মজুরি, দাম, মুনাফা, প্রবন্ধে ব্রিটিশ নাগরিক ওয়েস্টানের এই যুক্তিকে খণ্ডন করে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি সম্পর্কে সুন্দর মতামত ব্যক্ত করেছেন—

> *বছরের পর বছর উৎপন্নের মূল্য ও পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়ছে এবং এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, ক্রমাগতই তার পরিবর্তন ঘটছে। বছর শেষের হিসাবে যা সত্য, বিভিন্ন বছরের তুলনামূলক হিসাবে যা সত্য— বছরের প্রতিটা গড়পড়তা দিনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা আয়তন নিরন্তর বদলাচ্ছে। এটি স্থির নয়, বরং এটি একটা পরিবর্তনশীল পরিমাণ, আর জনসংখ্যার পরিবর্তনের কথা না ধরলেও পুঁজি সঞ্চয় ও শ্রমের উৎপাদন শক্তিতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটনার দরুন তা না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, আজ যদি মজুরির সাধারণ হার বৃদ্ধি পায় তবে তার পরিমাণ ফল যাই হোক না কেন ঐ বৃদ্ধি আপনা থেকেই, অবিলম্বে উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবে না। সর্বাগ্রে বর্তমান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির আগে জাতীয় উৎপন্ন যদি স্থির না হয়ে পরিবর্তনশীল থেকে থাকে, তবে মজুরি বৃদ্ধির পরেও তা স্থির না থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে।* [৩৯]

মার্কসবাদে সর্বদা শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত। শ্রমিকের কর্মদিবস, শ্রমিকদের কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য ও শ্রমের নিবিড়তা, কর্মদিবস স্থির প্রয়োজনে কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য হ্রাস, সময় হিসাবে মজুরি, ফুরন-মজুরি প্রভৃতি বিষয়ের উপরে সদাসর্বদা আলোকপাত করা হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণি 'শ্রমের মূল্য'-এই কথাটির মধ্যে মূল্যের ধারণাকে মুছে দেওয়া হয়েছে তাই নয় বরং বাস্তবে তার ধারণাটাও উলটে দেওয়া হয়েছে— এই কথাটি এখন মাটির মূল্য কথাটির মতোই কাল্পনিক। যদিও এই কাল্পনিক কথাগুলো উৎপাদনের সম্পর্কগুলি থেকেই উদ্ভূত হয়। এগুলি হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয় সম্পর্কগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসমূহের বিভিন্ন ধারণা। চাহিদা ও সরবরাহের সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল। চাহিদা ও সরবরাহ যদি পরস্পরের সমানও হয় তা হলে মূল্যের এই দোদুল্যমানতার অবসান ঘটে। যদি অন্যান্য সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকে। সেক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমের দাম হচ্ছে স্বাভাবিক দাম আর চাহিদা সরবরাহ সম্পর্ক থাকে স্বতন্ত্রভাবে। শ্রমের মূল্য ও দাম বা মজুরি সম্পর্কে কার্ল মার্কস তাঁর 'ডাস ক্যাপিটাল' (পুঁজি) প্রবন্ধে স্বতন্ত্র মতবাদ প্রদান করেছেন—

'শ্রমের মূল্য ও দাম' বা 'মজুরি'— এসব বাস্তব রূপ সম্পর্কে অবশেষে এটুকুই বলা যায় যে, তাদের মধ্যে মূর্ত মৌলিক সম্পর্ক, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্য ও দামের সঙ্গে এগুলিকে তুলনা করলে সেই পার্থক্যই দেখা যায়, যে পার্থক্য দেখা যায়, সমস্ত বিশ্বব্যাপারে ও তার গুপ্ত অন্তঃস্তরের মধ্যে তুলনায়। প্রথমটি প্রচলিত চিন্তারীতি রূপে প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়, দ্বিতীয়টিকে আগে বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হতে হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বিষয়গুলির মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কের খুব কাছাকাছি আসে, যদিও সচেতনভাবে সে সম্পর্কে কোনো সূত্র রচনা না করেই। সেটা তা করতে অক্ষম, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার বুর্জোয়া গাত্রচর্মের আবরণে ঢাকা থাকে। [৪০]

শিল্পী হোক, সাহিত্যিক হোক আর দার্শনিকই হোক সকলেই শেষপর্যন্ত সামাজিক জীব। তাই শিল্পীর শিল্পচিন্তায়, সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তায়, দার্শনিকের দর্শনচিন্তায়, বা বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক ভাবনায় সবকিছুর উপরেই প্রত্যেক সমাজের প্রভাব এসে পড়ে। মেহনতকারী মানুষের মানসিকতা, চরিত্রগঠনেও সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমাজ গড়নকে নিয়েও মার্কসবাদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সমাজের ক্রমাগত পদ পরিবর্তন, উত্থান-পতন সবকিছুই আলোচিত হয়েছে। সভ্যতা শুরুর আগে সমাজ কেমন ছিল? কীভাবে সৃষ্ট হল মানুষের সমাজ, কেমনভাবে গড়ে উঠল সভ্যতা? ক্রমাগত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কীভাবে পরিবর্তন শুরু হল, পরিবর্তনের ফলে সমাজের নতুন রূপ কেমনভাবে ধরা ছিল? সভ্যতা শুরু হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন ভাঙাগড়া কেমনভাবে বদলেছে, সেই বদলের কারণগুলি কী কী, আগামী দিনে তার রূপটা কেমন হবে? এইসব বিষয় নিয়ে মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে এই দিকটাও আলোচিত। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আলোচনা। ইতিহাসের পরিবর্তন, ইতিহাসের নানা ধারা নিয়েও আলোচনা। ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসবাদের ধারণা হল—

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটায় ইতিহাসের এই বাস্তব ভিত্তিটাকে হয় একেবারেই তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, নইলে সেটাকে বিবেচনা করা হয়েছে ইতিহাসের ধারার পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অবান্তর একটা গৌণ বিষয় হিসেবে। কাজেই ইতিহাস সবসময় লিখিত হওয়া চাই একটা বহিস্থ মানদণ্ড অনুসারে, যথার্থ জীবন উৎপাদন মনে হয় যেন আদিযুগীয় ইতিহাস, আর যা যথার্থ ঐতিহাসিক সেটা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অধিপার্থিব-বহির্ভূত একটা কিছু বলে প্রতীয়মান হয়। এই মনে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টাকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়, আর তার থেকে সৃষ্টি করা হয় প্রকৃতি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধতা (antithesis)। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণার প্রবক্তারা কাজে কাজেই ইতিহাসে দেখতে পেরে উঠেছেন শুধু রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিক কৃতিগুলো, ধর্মীয় এবং সবরকমের তত্ত্বগত সংগ্রামগুলো, আর

বিশেষত প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক যুগে তাঁদের সেই যুগের বিভ্রান্তিতে শরিক হতে হয়েছে।[৪১]

কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের একজন বড়ো সমালোচক ছিলেন। সেই সঙ্গে দাস ব্যবস্থা বা সামন্ততন্ত্রের মতো ব্যবস্থাগুলিকে তিনি নিন্দার চোখে দেখতেন। তিনি চাইতেন বিপ্লবের স্বাধিকার, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং সমকালীন সমাজে গণতন্ত্রের মতো আদর্শগুলি রূপায়িত হোক। তিনি মনে করতেন মানুষের ইতিহাসে দাস ব্যবস্থা বা সামন্ত্রতন্ত্রের মতো যে ব্যবস্থাগুলি দেখা গেছে তার থেকে ফরাসি এবং আমেরিকান বিপ্লবের সময় প্রচারিত ধনতন্ত্র তার চেয়ে শ্রেয়। মার্কস এটাও বিশ্বাস করতেন—

> *ফরাসি এবং আমেরিকান বিপ্লবীরা যে স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ধনতন্ত্র সেগুলিকেও নিয়ে আসবে।*[৪২]

আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ধনতন্ত্র দ্রুত এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। তাতেও দেখা যায় এক বিপুল বৈষম্য, একদিকে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ যারা আর্থিকভাবে ক্রমাগত সচ্ছল হতে থাকে ও আনন্দ ফুর্তিতে দিন কাটাতে থাকে। অন্যদিকে কৃষি শিল্প ও নানান পরিষেবার সঙ্গে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষেরা জীবন যন্ত্রণাময়তা ও দারিদ্র্যতার মধ্যে দিন কাটতে থাকে। এই শ্রমজীবী, দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষগুলি ধনতন্ত্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রেখেছিল। ধনতন্ত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সামন্ততন্ত্র দাসব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্বের ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে। তাই শ্রমজীবী মানুষরা সামন্ততন্ত্র ও দাসব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনে রক্তাক্ত বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ধনতন্ত্র সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। মার্কসের মতে—

> *ধনতন্ত্র তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।*[৪৩]

ধনতন্ত্র যখন প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ মার্কস তাকে নিয়ে গভীর বিচার ও বিশ্লেষণ করলেন। ব্যর্থতার প্রকৃত কারণও অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন সাম্য, স্বাধিকার, সৌভ্রাতৃত্ব গণতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণে ধনতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ তার নিজের কাঠামো ও সামাজিক প্রক্রিয়া। মার্কস শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন— স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের পথে যথার্থ অগ্রগতি হতে চাইলে ধনতন্ত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নতুন এক অন্য ব্যবস্থায় পৌঁছানো দরকার। সেই নতুন ব্যবস্থায় পৌঁছানোর পথে তিনি ধনতন্ত্রের ব্যর্থতার দিকগুলি স্মরণে রাখলেন এবং নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যা সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। ধনতন্ত্র প্রতিশ্রুতি না রক্ষা

করতে পারার কারণ হিসেবে মার্কস দেখিয়েছিলেন সেখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে সমস্ত মালিকানা, সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত। শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য হিসেবে উৎপাদন মূল্যের কতটা অংশ দেওয়া হবে, তাদের উদ্‌বৃত্ত শ্রমের উৎপাদন নিয়ে কী করা হবে, কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে, তা ওই উপরতলার অল্প সংখ্যক লোকই ঠিক করতেন। এইসব বিষয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব, মূল্য সচরাচর দেখা যেত না। সমাজের অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের সিদ্ধান্ত বৃহদাংশের শ্রমজীবী মানুষকে তা মেনে চলতে হত। এটা গণতন্ত্র নয়, এটা গণতন্ত্রের বিপরীত অবস্থা। এরফলে দরিদ্র দরিদ্রই থাকে। ধনী ক্রমাগত আরও ধনী হয়ে ওঠে। মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ হরণকারী এই ধনতন্ত্র প্রথার সমাপ্তি হওয়া আবশ্যক। মার্কসের মতে—

দারিদ্র নির্মূল করার জন্য ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অন্য ব্যবস্থায় যাওয়া আবশ্যক।[৪৪]

মার্কসবাদের নানান দিক— দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদকে ভীতিপ্রদ পণ্ডিতি ব্যাপার বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। মার্কসবাদ হল মেহনতকারী মানুষের তরফের কথা, তাই মেহনতকারী মানুষের জীবনের সঙ্গে মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলেই মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলি মেহনতকারী, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে বোঝা অনেক সহজ ও সরল। শ্রমজীবী মানুষ মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে ও হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বরং যারা শুধু মহা পণ্ডিত তাদের পক্ষেই এইসব কথা অমন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে বাধা হয়ে ওঠে। কেন-না পাণ্ডিত্যের কুয়াশায় তারা নিজেদেরকে আচ্ছন্ন রাখেন, পুথির ধুলোয় তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। জীবনকে বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে, প্রত্যক্ষভাবে তাদের চেনবার সুযোগ কম। কিন্তু মেহনতকারী মানুষের পক্ষে সে কথা খাটে না। জীবনের সঙ্গে তাদের সম্মক পরিচয়। আর মার্কসবাদ যেহেতু জীবনের কথাই, তাই মার্কসবাদকে, মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে এই শ্রমজীবী মানুষেরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারে। এই বুঝতে পারাটা তর্কবিতর্ক দিয়ে বোঝা নয়, পুথির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝা নয় এই বোঝাটা হল অনেক বাস্তব, অনেক প্রত্যক্ষভাবে বোঝা। তা সেটা দর্শনের ক্ষেত্রে হোক বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক বা রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

উৎপল দত্ত সমস্ত জীবন ধরে তাঁর শিল্পকর্মে এই মার্কসবাদী ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে লালন-পালন ও বহন করে গেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবীর থিয়েটার। তার সৃষ্টির মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তাধারা, তার রাজনৈতিক

কার্যকলাপ, বুর্জোয়া শ্রেণির দর্শন প্রভৃতি সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার প্রবল বিরোধী ছিলেন। মূলত মার্কসবাদী আদর্শ, মার্কসবাদী ভাবনাকেই তাঁর থিয়েটার ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। মার্কসবাদী আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। উৎপল দত্ত তাঁর সৃষ্টি কর্মে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি প্রধান সূত্রকে সফল ও সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে গিয়েছিলেন—

> *এক, 'শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো'। দুই, 'অতীত শিল্পসাহিত্যের যা কিছু মূল্যবান সেই সব জনতার কাছে পৌঁছে দাও।' তিন, 'তোমরা বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দাও।'— এই তিনটি সূত্রই ছিল উৎপল দত্তের সমগ্র শিল্পচেতনার ভিত্তিস্বরূপ।* [৪৫]

উৎপল দত্ত মননে, চিন্তনে ও থিয়েটার ভাবনায় সর্বদা ছিলেন প্রকৃত স্তালিনবাদী। উৎপল দত্তের থিয়েটার সৃষ্টি হয়েছিল নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর নাটক সদা সর্বদা গর্জে উঠেছে যখন তিনি দেখেছেন শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা সমাজের মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন। তিনি মনে করতেন—

> *মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদ।* [৪৬]

মার্কসবাদী রাজনীতি হল শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদকে জানতে ও বুঝতে গেলে শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মেহনতকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। জঙ্গি পরিচালক বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট মনে করতেন অভিনেতাদের প্রকৃতপক্ষে অভিনয় শিখতে গেলে ও অভিনয় শিল্পকে যথাযথভাবে উন্নত করতে হলে অভিনেতাকে প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালা ও নাট্যকলার সুগভীর যোগাযোগের কথা বলেছেন ব্রেখ্‌ট। উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট-এর এই মতাদর্শের পরিপন্থী ছিলেন। 'ব্রেখ্‌ট ও মার্কসবাদ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> *শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্‌টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।* [৪৭]

উৎপল দত্ত শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণিকে ও শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। উৎপল দত্ত শ্রমিক শ্রেণির ওপরে শাসক ও

জমিদারবর্গের অত্যাচার শোষণ-নিপীড়নের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বিভিন্ন কালজয়ী নাটক। স্কুলে পড়বার সময় বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট সম্পর্কে যে পুথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা তিনি নাটকে প্রয়োগ করে সেই বামপন্থী নীতি আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে নাট্যাঙ্গনে আনয়নের মধ্য দিয়ে। 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টত বলেছেন—

> *বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল কিছু চাষির কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে।* [৪৮]

উৎপল দত্ত শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উন্নীত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক জগৎকে বুঝতে গেলে ও জানতে গেলে পার্টির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা বা কোনো আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ই না, বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়। 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে-লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণি সংগ্রামে নাটককে শামিল করা যাবে না।* [৪৯]

শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বৈপ্লবিক থিয়েটারই ছিল উৎপল দত্তের থিয়েটার দর্শন। তাঁর থিয়েটার বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনীতি, চিন্তাধারা, দর্শন প্রভৃতির সক্রিয় বিরোধিতা করতে পিছুপা হয়নি সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ ও ভাবধারার বিরোধিতা করা তাঁর থিয়েটারের ছিল মৌলিক কর্তব্য। বৈপ্লবিক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বিপ্লব প্রচার করা, শোষক, শাসকদের বিরুদ্ধে শ্রেণিঘৃণা জাগ্রত করা। থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষ, মেহনতি মানুষ ও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে শ্রেণি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। দার্শনিক স্তরে বৈপ্লবিক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান কাজ হল বৈপ্লবিক সত্যে উপনীত হওয়া। উৎপল দত্তের সুস্পষ্ট অভিমত, বাস্তবে যা ঘটছে তাই শুধু নাটকে তুলে ধরার বিষয় নয়, বরং যা ঘটবে বা যা ঘটার কথা বা যা ঘটা উচিত তা সত্যিকারের

নাটককারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি মনে করেন, বৈপ্লবিক সত্যে পৌঁছতে গেলে বহু মিথ্যাকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হয়। 'রাজনৈতিক নাটক : একটি কলহ' প্রবন্ধে তিনি এই সত্য সম্পর্কে বলেছেন—

> *সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতী মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি, তাই তার সত্যটাই সত্য। ... গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট দুজনেই বলে গেছেন— যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে, যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব।* [৫০]

বিপ্লববাদ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার্য না হলে চরম বিভ্রান্তি সংগঠিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য দেখে দেশবাসীকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে নিরন্তর। প্রতিপক্ষের এইরকম ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতি লক্ষ রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান অধ্যায়গুলো নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরার প্রয়াস করলেন। সমস্ত সংগ্রাম বিপ্লবকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করার প্রবণতা তাঁর নাট্য জীবনের শুরু থেকেই। 'Towards Revolutionary Theatre' প্রবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> *From the very begining of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perpective।* [৫১]

শোষিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপল দত্ত লক্ষ করেছিলেন ভারতের শাসক শ্রেণি আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা জনতার মধ্যে প্রচার করার প্রবণতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছিল যে— ভারতবর্ষ শান্তির দেশ, সহিষ্ণুতার দেশ, অহিংসার দেশ। ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসা ও সহনশীলতার আদর্শ বিশ্বকে শিখিয়েছে। এ তথ্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন উৎপল দত্ত এবং বলেন— এগুলো হচ্ছে বিশুদ্ধ 'বুর্জোয়াতত্ত্ব'; ভারতবর্ষের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়— ভারতবর্ষের মাটিতেই সংগঠিত হয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনাগুলি। এদেশের রক্তাক্ত ইতিহাসের সমকক্ষ ইতিহাস অন্যত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উৎপল দত্ত মনে করেন, ইতিহাসের এই মিথ্যা আস্ফালনকে প্রতিহত করে নাট্যকারের কাজ হওয়া উচিত নাটকের মাধ্যমে জনতার কাছে এটাই পৌঁছে দেওয়া যে, ভারতবর্ষ আবহমান কাল ধরেই যুদ্ধের উপাসক ও সংগ্রামের পরিপন্থী। তিনি মনে করেন নাটকের কাজ হচ্ছে এই সত্য উন্মোচন করা যে, শান্তি সম্পর্কে যে মিথ্যা তথ্যগুলো জনতাকে গলাধঃকরণ করা হচ্ছে সেটা আসলে শাসক শ্রেণির এক ঘৃণ্য প্রতারণার কৌশল মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার অস্ত্র

তুলে নিয়েছে নিজ হস্তে। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, শিখদের যুদ্ধ, মহীশূরের সংগ্রাম, ওয়াহবি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, বীরসা মুণ্ডার যুদ্ধ, বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ প্রভৃতি— বিশ্বের খুবই কম দেশেরই এরকম সংগ্রামের কাহিনি পরিলক্ষিত হয়। অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরকম সশস্ত্র দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্ব সংগ্রামের ইতিহাসে অপ্রতুল। ভারতীয় শাসক শ্রেণির পক্ষ থেকে এদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসটাকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা নিরন্তর। কারণ তারা জানে এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা তাদের বিরুদ্ধে চালিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই তারা ভাড়াটে ইতিহাসবিদ্ তথা লেখকদের দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনিটাকে মুছে ফেলে নতুন ইতিহাস লেখাতে তৎপর। উৎপল দত্ত নাটক বা থিয়েটারে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন—

> *সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী। ... বড় ভীষণ খেলা খেলছে শাসকশ্রেণির ভাড়াটে লেখকরা। ... একবার যদি দেশের মানুষের দেশপ্রেমিক অতীতটাকে মসিলিপ্ত ক'রে দেয়া যায়, ... তাহলে দু'শো বছরের অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়ে পড়ে অসভ্য আরণ্যক মানুষের ব্যর্থ উল্লম্ফন। এরা মানুষকে তার গর্বিত অতীত থেকে বিয়োজিত করতে চায়, যাতে সে হয়ে পড়ে নিরুদ্যম, হতাশ, সংগ্রামবিমুখ।*[৫২]

শাসকশ্রেণি দ্বারা ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা, নাটক ও থিয়েটারে সেই সংগ্রামের কাহিনি ও ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত তাঁর 'Towards A Revolutionary Theatre' প্রবন্ধে বলেন—

> *It is, therefore, our task to re-affirm the violent history of India, to re-affirm the martial traditions of its people, to recount again and again the heroic tales of armed rebels and martyrs।*[৫৩]

উৎপল দত্ত মনে করেন সমাজ বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে শুধুমাত্র একটি জিনিস বোঝায়, তা হল মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ধারা ও সমাজমূল্য প্রচার করা হল নাট্যকার ও থিয়েটারওয়ালার অন্যতম প্রধান কাজ। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সর্বহারার হাতে অস্ত্রের সম্ভার স্বরূপ। সর্বহারা শ্রেণি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে আশ্রয় করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আগামীর পাথেয় খুঁজে পান। ব্রেটোল্ড ব্রেখট্ সারাজীবন এই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ধারার প্রচারক ছিলেন। যেটা আমাদের নাট্যকারেরা কখনও করে উঠতে পারেননি, তার কারণ হল আমাদের শ্রেণিগত অবস্থান। আমরা যে সমাজ থেকে এসেছি

সেই পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলেই আমরা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে সঠিকভাবে প্রচারে অক্ষম। তিনি মনে করেন শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া নিজ পাঠাগারে বসে গ্রন্থকীটের মতো অনবরত মার্কসবাদ অধ্যয়ন করলেও সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা যায় না। সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটি হল শ্রেণিসংগ্রামে সরাসরি যুক্ত থাকা। সর্বহারার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা, এর সঙ্গে মার্কসবাদের বিভিন্ন মতাদর্শের গভীর অধ্যয়ন উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ। এসবের সমন্বয়ে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সম্ভব। উৎপল দত্ত 'বিষয় থিয়েটার' গ্রন্থে মন্তব্য করেন—

> *অনেকে আছেন যাঁরা নিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তারপর এসে নাটক করেন অথবা লেখেন। কিন্তু তাঁদেরও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে ব'লে আমি মনে করছি না, তাঁরা কিন্তু লেখেন পাতি বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই। তাঁদের এই শ্রেণিসংগ্রামের ফলে যে জিনিসটা হওয়া দরকার ছিল তা হল, তাঁদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তাঁরা সর্বহারা দৃষ্টিকোণটা নিজের ক'রে নেবেন। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। তাঁরা অনেক শ্রেণীসংগ্রাম, অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও পাতি বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণটাই আশ্রয় ক'রে বসে থাকেন এবং তাঁদের লেখায়, তাঁদের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সেটাই প্রকাশ পায়।*[৫৪]

উৎপল দত্ত মনে করতেন রাজনৈতিক নাটক করতে গেলে মধ্যবিত্ত শিল্পীর সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট। মানসিক দিক থেকে নিজ নিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা অবশ্যকীয় কর্তব্য; কারণ মার্কসীয় বিপ্লব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিপ্লবের অগ্রণী বাহিনী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি, সেখানে মধ্যবিত্তের কোনো স্থান নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় শ্রেণিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে মধ্যবিত্ত মানুষের চরমভাবে ব্যর্থতা। মধ্যবিত্ত শিল্পীরা সহজে শ্রেণিচ্যুত হতে পারতেন না, তার কারণ হল মার্কসবাদের ওপর তাদের সম্পূর্ণ দখল নেই। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাদের পড়াশোনা যেমন খুবই কম, সেই সঙ্গে মার্কসীয় জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা ভাসা। তাদের রাজনীতি চেতনার প্রধান ভিত্তি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নয়, বরং বিপরীত দিকে মধ্যবিত্তের ভাবালুতাসর্বস্ব একধরনের গরিবী দরদ। উৎপল দত্তের মতে এটি পাতি বুর্জোয়া মানসিকতার নগ্ন রূপ। মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট বা মানসিকভাবে শ্রেণিচ্যুত হওয়া বিষয়টা উৎপল দত্ত 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে—

> *ডিক্লাস্‌ড দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী যে কোন্ শ্রেণীর জন্য নাটক করা হচ্ছে,... কার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাটক হচ্ছে, কার প্রয়োজনে নাটক, কোন্ শ্রেণীর প্রয়োজনে? ... আমাদের নাট্য-আন্দোলনের*

এক বিশাল অংশ শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী বা বুদ্ধিবাজদের জন্য নাটক ক'রে থাকেন, আর শ্রমিক-কৃষক অঞ্চলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারছেন না— নাটক লেখা বা প্রযোজনা করার সময়ে প্রথম যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের নাটক শ্রমিক দেখবে, কৃষক দেখবে ... তাদের যদি ভালোলাগে তাহলে আমাদের নাটক ভালো হয়েছে আর তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে বুঝতে হবে আমাদের নাটক ব্যর্থ হয়ে গেছে। ... যা-ই করি না কেন সেটা শেক্স্পিয়ার, গিরিশ ঘোষ বা পথনাটিকাই হোক, দেখতে হবে সেটা শ্রমিক-কৃষক বুঝতে পারলো কি না। [৫৫]

উৎপল দত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট অর্থাৎ শ্রেণিচ্যুতির বিষয়টি গভীরভাবে ও একনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেছিলেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে। তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায় যে অসামান্য দক্ষতায় এই বিষয়টির স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন উৎপল দত্ত। জপেন দা আসলে উৎপল দত্তরই কণ্ঠস্বর। জপেন দা চরিত্রর মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত নাটক, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস প্রসঙ্গে গভীর চিন্তা ও উপলব্ধিগুলি অতি সহজ ও উপভোগ্যভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কিছু নবীন মার্কসবাদী নাটককার, যারা মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম নিয়ে নাটক লেখেন, যারা গণনাট্য সংঘের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক লিখতে উদ্যোগী হন উৎপলের কণ্ঠস্বরের আড়ালে জপেনদা তাদের নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন ও মার্কসবাদ সম্পর্কে সচেতন করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

উৎপল দত্ত মধ্যবিত্তের পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখান পাতি বুর্জোয়া বামপন্থীদের রাজনৈতিক নাটকে যেসব নিষ্কলুষ নিষ্পাপ কমিউনিস্টদের তুলে ধরা হয় সেটা মূলত একটা বুর্জোয়া তত্ত্বের রূপায়ণ। সমাজ বিচ্ছিন্ন, মানুষ বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তরা কৃষক-শ্রমিককে সঠিকভাবে চেনে না বলেই তাদের নাটকে শ্রমজীবী মানুষ কখনো রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে না, শ্রমজীবী মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে বিমূর্ত ধারণা হিসেবে এসে ওঠে। সেইজন্য পাতি-বুর্জোয়ার নাটকে কমিনিউস্টের চরিত্রগুলিও হয়ে ওঠে অবাস্তব, সর্বগুণসম্পন্ন, একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মহাপুরুষ রূপে। এই মহৎ পুরুষ মার্কা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট চরিত্রগুলি আসলে প্রকৃত বিপ্লবের সমূহ ক্ষতি করে। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে অতীব সুন্দর ব্যাখ্যা দান করেছেন—

ঐ দেবতাদের দেখে চাষী-মজুর কী ভাবে? ... ভাবে, আমি এ জন্মে অমন হইতে পারবো নি বাপু! ই কি রে ভাই? ই তো দেখি পরমপুরুষ, অবতার! এ বউরে ঠেঙায় নে, বাপের সোংগে ঝগড়া করে নে, খেতে দিতে না পেরে পিটিয়ে বালবাচ্চাগুলোনরে চুপ কইরে রাখে নে! এই যদি বিপ্লবী হয়, তার আমি বিপ্লবী হইতে পারবো নি। বিপ্লবী হওয়া মোর পক্ষে সম্ভবই নয়। [৫৬]

পাতি-বুর্জোয়া নাট্যকারের বিপ্লবী নাটক তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য বিপ্লবী শ্রেণিকেই রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখে। বাবু গোছের বা দেবতা স্বরূপ বিপ্লবীদের দেখে শ্রমিক-কৃষকরা তার সঙ্গে নিজের আত্মিক মিল গড়ার বদলে সেই বাবু গোছের বিপ্লবীর থেকে মানসিকভাবে অনেকটা দূরত্ব তৈরি করে। ফলে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আন্দোলনের ও রাজনৈতিক সংগ্রামের নাটক তখন হয়ে ওঠে ভুল রাজনীতির প্রচারক এবং তা হয়ে ওঠে অপরিপক্ক রাজনীতির হাস্যকর উপকরণ। রাজনৈতিক থিয়েটারে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানের জন্য তা সঠিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠতে পারে না। মধ্যবিত্তশ্রেণির পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী— যা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। পাতি-বুর্জোয়া বামপন্থীদের রাজনৈতিক নাটকে যেসব সহজ সরল, সাদাসিধে নিষ্পাপ কমিউনিস্টদের তুলে ধরা হয়, সেটা আসলে একটা পাতি-বুর্জোয়া তত্ত্বের রূপায়ণ। পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণি যে সর্বগুণের আধার নির্লোভ বীর কমিউনিস্টদের নায়ক হিসেবে নাটকে দেখায় তা এই সমাজ ব্যবস্থার একটি ভুল চিত্র। উৎপল দত্ত মনে করেন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই যদি সুন্দর-নিখুঁত সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ উপস্থিত থাকে, তাহলেই সমাজ ব্যবস্থা বদলানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বিপ্লবের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আসলে এইভাবে পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক নাটক, তথা বিপ্লবী নাটক আসলে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি মাত্র। মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ও ভুল রাজনীতির প্রচারক সর্বস্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপল দত্ত বারেবারে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর ও সম্যক জ্ঞান না থাকলে রাজনৈতিক থিয়েটার সঠিকভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদ গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে রাজনৈতিক থিয়েটার পথভ্রষ্ট হবেই। তিনি তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে পাতি-বুর্জোয়া বামপন্থী নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে জপেন দা নামক চরিত্রের জবানিতে বলেছেন—

> *তোরা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পড়িস না, বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ইতিহাসও পড়িস না। তাই বুঝিস না এ ব্যবস্থায় বঞ্চনা ও শোষণ কতদূর গেছে। তোরা জানিস না, অর্থনৈতিক রাহাজানির দাপটে শ্রমিক-কৃষককে কোন পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে শয়তানরা, কীভাবে তারা কেড়ে নিয়েছে শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য; মানবতা। তোরা পাতি-বুর্জোয়ারা 'শ্রমিক' বলতেই কেমন গদগদ ভাববিহ্বল গাধা হয়ে উঠিস। মাঝে আবার তোদের কৃষকে পেয়েছিল, ছাপার অক্ষরে লিখতে শুরু করেছিলি 'কৃষক রাজ কায়েম' করার কথা, 'কৃষকের পায়ের কাছে বসে, শিক্ষা লাভ করার কথা। পাতি-বুর্জোয়ার স্বপ্নালু চোখে শ্রমিক-কৃষককে দেখিস, শ্রমিকের চোখে দেখিস না। মাও বলেছিলেন, শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। তোরা সেদিকে মাড়াসনি*

কখনো। তোরা শ্রমিক বলতে বুঝিস শুধু সংঘবদ্ধ বিপ্লবী শক্তি। তোরা আড়াল ক'রে রাখছিস শ্রমিকের বিধ্বস্ত ব্যক্তিসত্তা এবং এভাবে তোরা গোপন ক'রে রাখছিস এই সমাজব্যবস্থার সর্বগ্রাসী শোষণের চেহারা। [৫৭]

উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রাজনৈতিক নাটকে শ্রমিকের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে হবে। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রমিক বলতেই যে ন্যাকা ন্যাকা ভাবাবেগ জাগ্রত হয় সেটি বর্জন করা অবশ্যকীয় কর্তব্য। শ্রমিক যা আছে তার প্রকৃত অবস্থায় তুলে ধরতে হবে। শ্রমিকের অধঃপতন, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, মদ্যপান, নারী নির্যাতন সবকিছুই দেখাতে হবে, কোনোকিছুই বাদ দেওয়া চলবে না। শ্রমিকের প্রচণ্ড ধূর্ততা, শ্রেণি ঘৃণা, বীরত্ব ও সততা মহত্বের পাশাপাশি নিকৃষ্টতম গুণের সমাবেশও করতে হবে, তাহলেই শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। নইলে সে রাজনৈতিক নাটক হবে পাতি-বুর্জোয়ার কাল্পনিক মাত্র। শ্রমিক শ্রেণির নাম কর্ণগোচর হতেই যারা আবেগে ভাববিহ্বল গদগদ স্বপ্নালু হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির বিধ্বস্ত বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পারা অসম্ভব। শ্রমিকদের তোষামুদি নয়, তার বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানই রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে বলেন—

তোরা নাটকে শ্রমিক-কৃষকের খোসামুদি করিস, চাটুকারিতা করিস। লেনিন তোদের বলে গিয়েছিলেন, তোমরা বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দাও। অর্থাৎ তোরা শ্রমিকের রাজনৈতিক শিক্ষক, কিন্তু চাটুকার কি কখনো শিক্ষক হয়? তোষণ ক'রে কি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের কথা শেখানো যায়?... এঙ্গেল্‌স বহুদিন আগে বলে গেছেন : সমাজ বিবর্তনের নিয়মগুলি একবার সম্যক বুঝতে পারলেই মানুষ আর সে নিয়মের অন্ধ বলি হতে রাজি হবে না, সে লড়াই করবে। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের নিয়মগুলি তো তোরা গোপন ক'রে রাখিস। তোরা তো শ্রমিকের ধর্ষিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মুখ খুলতেই রাজি ন'স। ... কাল্পনিক বস্তির কাল্পনিক শ্রমিক তৈরি ক'রে তোরা তাকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করিস। বাস্তবের ভয়ংকর বস্তির বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। [৫৮]

মার্কসবাদীরা যদি শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারে তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার ভয়ংকর ফল নেমে আসে। তিনি লক্ষ করেছিলেন সংস্কৃতির জগতে যে বিভিন্ন ধ্বংসকার্য সংগঠিত হয়েছিল তার কারণ ছিল মার্কসবাদীদের প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারার অক্ষমতা। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি অচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সংস্কৃতির জগতে এক অন্ধকার অধ্যায় ঘনিয়ে আসে, এর প্রধান কারণ মার্কসবাদী মহলে পাতি-বুর্জোয়া

দৃষ্টিভঙ্গির দৌরাত্ম্যের ফসল। অতীত ঐতিহ্যকে বাতিল করলে শ্রমিক শ্রেণি কখনোই তার নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। অতীত ঐতিহ্য, সাহিত্য থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে বিচ্ছিন্ন করা হলে, শ্রমিক শ্রেণিরা সংস্কৃতির জগতে অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি, শ্রমিক শ্রেণিরা নিজেরাই গড়ে নেবে, একথা উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন।

মার্কসের সমাজ বিশ্লেষণ ও ইতিহাস বিশ্লেষণের পথ ধরে উৎপল দত্ত দেখালেন ফিউদাল সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণিরা সমাজের সবচেয়ে উচ্চতর পদগুলিতে অধিষ্ঠিত। তারা নিজেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার অলিন্দে থেকে নিজেদেরকে উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে তোলার সুযোগ পেয়েছিল। নিজের মতো করে অগ্রসর চেতনার শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা বুর্জোয়া শোষণের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে যেমন নিঃস্ব হয়ে পড়ে তেমনি মানসিকভাবেও তারা হয়ে পড়ে রিক্ত ও দেউলিয়া। এই দেউলিয়া মানসিকতা নিয়ে কখনও সংস্কৃতিবাণ হওয়া সম্ভব নয়। একারণে অতীতের শিল্প সাহিত্য, শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক শ্রেণিরা বুর্জোয়া সমাজে না পায় কোনো শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ। ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই সঞ্চারিত হতে পারে না তাদের মানসপটে। উৎপল দত্ত শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জপেনদার জবানিতে দেখিয়েছিলেন পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টির মূল পার্থক্য। 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> *শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি গড়বে কে? শ্রমিকশ্রেণী। সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক স্তর কোন্ পর্যায়ে? বুর্জোয়া যখন বিপ্লব করেছিল তার অনেক আগে থেকেই বুর্জোয়া মহাজনী সমাজের উচ্চতর পদগুলির অধিকার, উচ্চশিক্ষিত, কালচার্ড। তাই ইংলন্ডে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে সেই বিপ্লবের পরে অবলীলাক্রমে বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির কাজে মেতে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু শ্রমিক কি বুর্জোয়া সমাজে সেই সুবিধা পেয়েছে যা বুর্জোয়া পেয়েছিল ফিউদাল সমাজে? একেবারেই না। বুর্জোয়া তো শ্রমিককে ক'রে রেখেছে নিঃস্ব। শ্রমিকের ট্যাঁক খালি, তার বাসস্থানের পরিবর্তে রয়েছে বস্তী, শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তে অমানুষিক পরিশ্রম। এমনকি তার সুকুমার বৃত্তিগুলি পর্যন্ত দলিত মথিত। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক একটি জ্ঞানই লাভ করে : সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা। শুধুমাত্র সেই চেতনার ওপর নির্ভর ক'রে আস্ত একটা শ্রেণীর নূতন শিল্পসাহিত্য গড়ে ওঠে না। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব; তাই অতীতের যা কিছু মূল্যবান সব গোগ্রাসে গেলার পালা।* [৫৯]

শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলেই একমাত্র মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার মর্মবস্তুকে হৃদয়াঙ্গম

করা সম্ভব। কিন্তু পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বামপন্থীরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে অপারগ। তারা শ্রমিক সম্পর্কে বড়োই অজ্ঞ, শ্রমিককে সঠিকভাবে জানে না ও চেনে না বলেই শ্রমিকের খণ্ডিত মনোজগতের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ। তারা নিজেদের মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি বলে চালাতে উদ্যোগী হন, ফলে শিল্প সংস্কৃতির জগতে বারবার অমার্কসীয় তাণ্ডব উপস্থিত হয়। বিষয়টি উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন—

> *কীসের ঐতিহ্যের কথা বলছিস? সাহিত্যের ঐতিহ্যের বন্ধনে শ্রমিক শ্রেণী বাঁধা পড়েছে নাকি? ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও সে পেয়েছে নাকি কখনো?... তোর কি ধারণা কলকাতার বস্তীতে সন্ধ্যার পর সবাই সুর করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে? তোর কী ধারণা বাঙালি শ্রমিক অবসর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে? ... আসলে এটাও তোদের পাতি-বুর্জোয়া বজ্জাতি। নিজেরা ঐসব পুরাতন সাহিত্য খুব কষে পড়ে নিয়েছিস ব'লে মনে করছিস শ্রমিক-কৃষকেরও পড়া হয়ে গেল। নিজেরা শাসকগোষ্ঠীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছিস শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি; তারপর নিজের মতামতটাকে শ্রমিক-কৃষকের মতামত বলে চালাচ্ছিস। মাও বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। আর তোরা পাতি-বুর্জোয়া চামারের দল নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে শ্রমিকের বলে চালাতে চাস। তুই ঐতিহ্য ভোগ করছিস বলে আর ঐতিহ্যের দরকার নেই, শ্রমিক-কৃষক যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই থাকুক, এই তো তোর বিধান।* [৬০]

উৎপল দত্ত মার্কসবাদী হিসেবে সদাসর্বদা মনে করতেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কখনো বিপ্লবী হতে পারে না, একমাত্র বিপ্লবী হল শ্রমিক শ্রেণি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে রয়েছে শুধু আপস ও ক্লীবত্ব। এদের মনে রয়েছে নারী বিদ্বেষের জঘন্য আস্তাকুঁড়, মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারের ভ্রান্ত ধারণা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধনী শ্রেণিদের নকল করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার হাস্যকর প্রবণতা। দেশের সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছে শ্রমিক ও কৃষককে অথচ পাতি-বুর্জোয়া মার্কসবাদীরা তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম বা বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন না। উৎপল দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান মধ্যবিত্ত শ্রেণিরা কখনও বিপ্লবী শ্রেণি নয়, হতেও পারে না। তিনি পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণির মনের অন্দরমহলটাকে টেনে নগ্ন করে দেন, যেখানে রয়েছে মেকি বিপ্লবের বুলি আর হাজারো কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন কলুষিত মন। বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্তরা একটি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণি মাত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি উৎপল দত্তের ক্ষোভ, ঘৃণা যেন ফেটে পড়েছে—

> *পাতি-বুর্জোয়ার অন্তরের গভীরে চিরদিন হঠাৎ-নবাব (up star) হবার বাসনা, সে বিলাস-ব্যসনের মাঝে পড়লে আত্মহারা হয়। সুযোগ পেলেই সে বুর্জোয়াকে নকল ক'রে পরম সন্তোষ লাভ করে।* [৬১]

মানুষ অপরিবর্তনীয়, সমাজ অপরিবর্তনীয়, রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয়— পাতি-বুর্জোয়াদের এই ধারণার ফলেই বুর্জোয়া যুগের শিল্প সাহিত্যে এক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হল, যাকে বলা হয়— 'বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদ'। এই বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের মূল কথা হল যা দেখছ, যেভাবে দেখছ হুবহু তাই শিল্প সাহিত্যে দেখাও। অর্থাৎ একজন নিঃস্ব, রিক্ত, উচ্ছিন্ন যাওয়া কৃষককে উচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখাও, কেন-না এই উচ্ছিন্নে যাওয়াটাই তাদের পরিচয়। একজন শ্রমিককে যদি নেশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হিসেবে দেখলে তাকে সেভাবেই হতাশাগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হিসেবেই শিল্প-সাহিত্যে দেখাতে হবে, কারণ সেটাই তার বাস্তব পরিচয়। কোনো তদন্ত নয়, কোনো অন্বেষণ নয়, মানুষ সমাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা নয়। যা দেখা, যেভাবে দেখা সেভাবেই তাকে শিল্প-সাহিত্যে স্থান দিতে হবে— সেটাই শিল্পের বাস্তবতা। কারণ মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র সবই তো অপরিবর্তনীয়। চারিপাশের পরিবেশ পরিস্থিতিকে যেভাবেই দেখছ সেটাকে সেভাবেই অবিকল শিল্প সাহিত্যে তুলে ধর। সেটাই বুর্জোয়া বাস্তবতা, সেটাই শাশ্বত বাস্তব। নিঃস্ব-রিক্ত সর্বহারা মানুষের মধ্যেও যে দার্শনিকতা লুকিয়ে থাকে বা তার মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ যোদ্ধা হওয়ার প্রবণতা লুকায়িত থাকে সেটা অন্বেষণ করা বুর্জোয়া শিল্পে নিষিদ্ধ। বুর্জোয়ার কাছে পুঁজিবাদই জগৎ অনড়, স্থানু ও শাশ্বত। জগৎ যে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে সেকথা তা তারা স্বীকার করেন না, সে সত্য তাদের কাছে অসহ্য। কারণ তারা জানেন পুঁজিবাদও একদিন অপসৃত হবে এই চিন্তা জনমানুষে জেগে উঠতে পারে। তাই বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদ সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে ভ্রান্ত অসত্য, খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *বাস্তবের হুবহু অনুকরণ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর শৈল্পিক প্রকাশ, তাদের বামন জগতের আস্ফালন। তারা সমাজ-পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা নিজেদের চোখ থেকে আড়াল করতে চায়। ... তারা একজন উচ্ছিন্ন কৃষককে ভিক্ষুকে পরিণত হতে দেখলে বাস্তবতার নামে তাকে অসহায় ভিক্ষুক হিসেবেই দেখবে ও দেখাবে। সেই ভিক্ষুকের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে একজন ভবিষ্যৎ যোদ্ধা বা দার্শনিক অথবা ক্রোধোন্মত্ত কোনো অপ্রত্যাশিত বীর, এটা বুর্জোয়ার সমাজশৃঙ্খলার পরিপন্থী, সুতরাং তাদের শিল্পে নিষিদ্ধ।* [৬২]

শ্রেণিসত্যের ধারণাটাকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মই সৃষ্টি করেছিলেন শ্রেণিসত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে বুর্জোয়া, দর্শন, তাঁর সমাজচিন্তা, তাঁর শিল্পচিন্তা, বুর্জোয়া রাজনীতি, তাঁর ইতিহাস চিন্তা সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। শিল্পকর্মে তিনি সর্বহারা শ্রেণিসত্যকে তুলে ধরেন যা বুর্জোয়া সত্যের বিপরীত। তিনি শ্রেণিসত্যের ঊর্ধ্বে এক মুহূর্তের জন্যও কোনো বিমূর্ত সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না।

তাঁর কাছে সত্য সবসময়ই 'শ্রেণিসত্য'— 'ক্লাসট্রুথ'। 'শ্রেণিসত্যের' বিষয়ে তাঁর 'Towards A Revolutionary Theatre' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> *I do not for a moment believe in the fiction of absolute truth, above classes, metaphysical and eternal. The revoluationary theatre has no time for impartial study of 'both sides' of the questions.* [৬৩]

তিনি তাঁর নাটক ও থিয়েটারে মাঝামাঝির দালালি দেখতে পাননি। নাট্যজীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত তিনি শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে থেকেছেন শ্রমিকসত্যকে সদাসর্বদা তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দিতে হবে, মানুষের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইজন্য নাটক ও থিয়েটারের প্রয়োজন বৈপ্লবিক বিষয় বস্তু। ব্রেটোল্ড ব্রেখট্ এর মতো উৎপল দত্ত বিশ্বাস করেন মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া কোনো থিয়েটারই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের থিয়েটার হতে পারে না। তাই তিনি মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা সমৃদ্ধ থিয়েটার নির্মাণে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সবকিছুকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনার নিরিখে যাচাই করে নাট্যাঙ্গণে আনয়নের প্রচেষ্টা করেছেন। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষের বিপন্নতা থেকে বাঁচানোই তাঁর নাটক সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। প্রভু শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই তাঁর থিয়েটারের মূল বিষয়। সে লড়াই ব্যর্থ বা সফল যাই হোক না কেন। তাই উৎপল দত্ত মনে করেন—

> *সত্য সর্বসময়ে শ্রেণী-সত্য— ক্লাস ট্রুথ, হয় আপনি এ শ্রেণীর সত্য বলবেন, না-হয় ও শ্রেণীর সত্য। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণী-সত্য।* [৬৪]

শ্রেণি সংগ্রাম বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর জায়গা থাকে না। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন সর্বহারা সত্যই এক এবং অন্যতম বৈপ্লবিক সত্য। বুর্জোয়ার সত্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোনো সত্যই নয়, কারণ ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথে ধাবমান, ধ্বংসের পথের পথিক। শ্রেণিসত্যের বিষয়টি উৎপল দত্ত বিশদভাবে তাঁর 'Towards A Revolutionary theatre' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

> *Of course there are at least two sides to a question, in other words there are at least two truths involved in every issue. They are class-truths What is true for the proletariat is false for the bourgeois, and vice versa.* [৬৫]

আজীবন নিরলস নিরন্তর নাট্যচর্চার মাধ্যমে উৎপল দত্ত ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও জনমানুষের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর অভিলাষী ছিলেন। চল্লিশের দশকের গণমুখী ধারার সঙ্গে তাঁর মার্কসীয় ধারা সমন্বিত করে তিনি ব্যাপক জনতার কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম অব্যাহত ছিল জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত। এবং সে রাজনীতি অবশ্যই মার্কসীয় রাজনীতি, মার্কসীয় আদর্শ, চিন্তা-চেতনায় সম্পৃক্ত রাজনীতি। যে ভাবধারার প্রতি, যে রাজনীতির প্রতি তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছিলেন ও লালন পালন করেছিলেন তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলা নাটক প্রকৃত অর্থে Revolutionary Theatre-এর দিশা খুঁজে পাক। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন— "যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল।"[৬৬] এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্সবাদ', 'স্তালিন লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ২৮৫

৩. তদেব, পৃ ২৮৫

৪. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৫৪

৫. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক একটি কলহ', 'জপেন দা-জপেন যা', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ২৩১

৬. তদেব, পৃ ২২৬

৭. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ৭৩

৮. তদেব, পৃ ৭৩

৯. তদেব, পৃ ৮৮

১০. তদেব, পৃ ৯০

১১. তদেব, পৃ ৯১

১২. তদেব, পৃ ১০১

১৩. তদেব, পৃ ১০৩

১৪. তদেব, পৃ ১১০, ১১১

১৫. তদেব, পৃ ৮০

১৬. তদেব, পৃ ৮১

১৭. তদেব, পৃ ৮১, ৮২

১৮. তদেব, পৃ ৮২

১৯. তদেব, পৃ ১২২

২০. তদেব, পৃ ১৩৩

২১. উৎপল দত্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', শরৎ, ১৪০০, পৃ ১৩০

২২. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত, এক সামগ্রিক অবলোকন, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫২

২৩. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, চৈত্র

১৪২০, পৃ ২৩০

২৪. তদেব, পৃ ২৩১, ২৩২

২৫. তদেব, পৃ ২৩১

২৬. সূত্র-২২, পৃ ৪৪৩

২৭. তদেব, পৃ ৪৪৪, ৪৪৫

২৮. তদেব, পৃ ৪৪৯

২৯. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩০. দর্শন চৌধুরী, 'রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্ত', থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১০ই অক্টোবর ২০০৭, পৃ ৩২৬

৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'মার্ক্সবাদ', 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ ২১

৩২. সূত্র-২, পৃ ২৮৫

৩৩. তদেব, পৃ ২৮৫

৩৪. সূত্র-৩১, পৃ ২৮

৩৫. মার্কস এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, বাংলা অনুবাদ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯, পৃ ১৬৪

৩৬. রিচার্ড ডি উল্‌ফ, মার্ক্সবাদ একটি প্রথম পাঠ, অনুবাদ : অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন চক্রবর্তী, জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ ৬১, ৬২

৩৭. সূত্র-৩১, পৃ ৩১

৩৮. মার্কস এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১, পৃ ৬২

৩৯. তদেব, পৃ ৬২

৪০. কার্ল মার্কস, পুঁজি, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সম্পা : প্রফুল্ল রায়, বাংলা অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ ৫১

৪১. সূত্র-৩৫, পৃ ৫২

৪২. সূত্র-৩৬, পৃ ৫২

৪৩. তদেব, পৃ ৫৪

৪৪. তদেব, পৃ ৮৮

৪৫. শঙ্কর শীল, 'দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন', উৎপল দত্ত মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ১৪২

৪৬. সূত্র-২, পৃ ২৮৫

৪৭. তদেব, পৃ ২৮৫

৪৮. সূত্র-৪৫, পৃ ৩৫

৪৯. সূত্র-৫, পৃ ২৩২

৫০. তদেব, পৃ ২৩০, ২৩১

৫১. Utpal Dutt, 'Political Theatre', 'Towards Revolution Theatre' Calcutta, 1995, M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd. P. 28

৫২. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', পূর্বোক্ত গদ্য সংগ্রহ, পৃ ১৮৩, ১৮৪

৫৩. সূত্র-৫১, পৃ ৫৭

৫৪. উৎপল দত্ত, 'বিষয় থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫ সংখ্যায় পুনমুদ্রিত, পৃ ৫৮

৫৫. সূত্র-১, পৃ ৯, ১০

৫৬. উৎপল দত্ত, 'ধর্মতলার হ্যামলেট', পূর্বোক্ত গদ্য-সংগ্রহ, পৃ ১৩৪

৫৭. উৎপল দত্ত, 'আধখানা মানুষ', পূর্বোক্ত গদ্য সংগ্রহ, পৃ ১৬৬

৫৮. তদেব, পৃ ১৬৬, ১৬৭

৫৯. তদেব, পৃ ১৭২

৬০. তদেব, পৃ ১৭৩

৬১. উৎপল দত্ত, 'চীনযাত্রী', কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯১

৬২. উৎপল দত্ত, 'গিরিশ মানস', কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ২৫৬

৬৩. সূত্র-৫১, পৃ ৫১

৬৪. সূত্র-৫, পৃ ২২৯

৬৫. সূত্র-৫১, পৃ ৫১

৬৬. উৎপল দত্ত, যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল (সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), দেশ, কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১, পৃ ৪২